কেমন হবে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের যিন্দেগী?
সীরাতের আলোকে রচিত ঈমানদীপ্ত একটি অদ্বিতীয় কিতাব-

নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী
(গরীব ইসলাম)

(তৃতীয় খণ্ড)

-শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ-

আবু আব্দুল্লাহ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ﴿٢١﴾

"তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ (তাআলার সন্তুষ্টি ও মহব্বত) এবং শেষ দিবসের (কামিয়াবীর) আশা রাখে, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ (উস্‌ওয়াতুন্ হাসানাহ্)।"

(সূরা আহযাব ৩৩:২১)

হযরত আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

“ইসলাম শুরুতে গরীব (অপরিচিত) ছিল, খুব শীঘ্রই তা আবার গরীব (অপরিচিত) হয়ে যাবে যেমনটি শুরুতে ছিল, সুতরাং সুসংবাদ গোরাবাদের জন্য (যারা অপরিচিত ইসলামকে নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরে রাখে)।”

(সহীহ মুসলিম)

[বি.দ্রঃ ‘গরীব’ শব্দটি আরবী শব্দ, যার অর্থ ‘অপরিচিত’। উর্দূ এবং বাংলাতেও ‘গরীব’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ ‘নিঃস্ব’। সুতরাং শব্দ একই হলেও বিভিন্ন ভাষায় অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।- অনুবাদক]

হযরত সা'দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু আম্মাজান হযরত আইশা রদিয়াল্লহু আনহাকে প্রশ্ন করলেন, হে মুমিনদের আম্মা! আমাকে নবীজী ﷺ-এর আখলাক সম্পর্কে বলুন। আম্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? সা'দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তখন আম্মা বললেন, কুরআনই হলো নবীজী ﷺ-এর আখলাক।

যেহেতু কুরআন নবীজী ﷺ-এর আখলাক, আর কুরআনই হলো সকল এলেমের উৎস, তাই নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীই হলো সকল এলেমের মূল কেন্দ্রবিন্দু, বাস্তব জগতে কুরআনের অনুবাদ। আর নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর যে ওয়ারিশ হবে বা সেই পবিত্র যিন্দেগীকে যে নিজের যিন্দেগী বানাবে কেবলমাত্র তারাই প্রকৃত আলেম, তাঁরাই প্রকৃত কুরআনের অনুসারী।

উলামায়ে কেরামের সমালোচনা না করা চাইঃ

সাবধান! খুব সাবধান! মুখ দিয়ে যেন 'আহলে হক' উলামায়ে কেরামের কোনো সমালোচনা বের না হয়! নাহলে ধ্বংস অনিবার্য!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না, এবং আমাদের আলেমগণের হক বুঝে না/ তাঁদের সম্মান করে না, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।" (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "আমি আমার পরবর্তী খলিফাকে অসিয়ত করছি এবং তাকে মুসলমানদের জামাত সম্পর্কে এই অসিয়ত করছি যে, সে যেন মুসলমানদের বড়দের সম্মান করে, তাদের ছোটদের উপর রহম করে, তাদের উলামাদের ইজ্জত করে,...........।" (বায়হাকী ১৬১/৮)

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুআয রদিয়াল্লহু আনহুকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "হে মুআয! আমার (যিন্দেগীর) অনুসরণ কর, যদিও তোমার আমল ও ইবাদতে ত্রুটি থাকে। হে মুআয! তোমার যবানকে হিফাযত কর, বিশেষ করে কুরআনের বাহকদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ থেকে বেঁচে থাক, তোমার অপরাধ অন্যের উপর চাপিয়োনা; নিজেকেই দোষী জ্ঞান কর, অন্যের প্রতি দোষারোপ না করে নিজে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো,.............."

প্রিয়নবী ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"

উম্মতের প্রথম শ্রেণির মানুষ হচ্ছেন সম্মানিত উলামায়ে কেরাম। তাঁদের এই মর্যাদা মূলত কুরআন কারীমের মর্যাদার কারণে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে সে ব্যক্তি সে অনুপাতে সম্মানিত হয়। যেহেতু কুরআন কারীম মহাবিশ্বের সবচেয়ে দামী ও সম্মানিত গ্রন্থ, তাই এর সাথে যারাই সম্পর্কিত তাদেরই মর্যাদা সর্বোচ্চে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যেমনঃ ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত তাঁরাই যারা লওহে মাহফুযে কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত, যারা লওহে মাহফুয থেকে কুরআন নকল করেন, আবার সকল ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত তিনি (হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম), যিনি নবীজী ﷺ-এর কাছে কুরআন নিয়ে এসেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও যারা কুরআনের ইল্‌ম এবং আমলের দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন, তাদের মর্যাদাও অন্যান্য সাহাবাদের চেয়ে বেশি ছিল (রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈন)।

যেহেতু উলামায়ে কেরাম নবীদের ওয়ারিশ, তাই প্রত্যেক যামানার আহলে হক উলামায়ে কেরাম সেই যামানার নবীদের মতো। সাধারণ মানুষদের উপর এটি ফরয যে, তারা হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের যিন্দেগী গড়বে। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না, তাই আল্লাহর রাসূলের পর উলামায়ে কেরামই প্রত্যেক যামানার উম্মতের রাহ্‌বার। এই যামানায় নবী আসলে তাঁকে যেভাবে সম্মান করা হতো, রাসূলের ওয়ারিশ হওয়ার কারণে তাই একজন সাধারণ উম্মতকে অবশ্যই উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো উলামায়ে কেরামকে অসম্মানিত করা প্রকারান্তরে কুরআনকে অবমাননা করা। তাঁর মাঝে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তার জন্য তিনি নিজে দায়ী থাকবেন। তথাপি তার প্রতি বে-আযমতী, বে-ইজ্জতিমূলক ব্যবহার বা তার সম্পর্কে এরূপ কোনো মন্তব্য করা উম্মতের জন্য কখনোই সঙ্গত নয়।

প্রশ্ন করতে পারেন, যদি কোনো একজন আলেমকে দেখা যায়, তিনি কোনো ভুল-ভ্রান্তি, বা গোমরাহীতে, কিংবা গোনাহে কবীরায় লিপ্ত, তাহলে কি করবো?

এক্ষেত্রেও আম-মজমাতে উলামায়ে কেরামের কোনো সমালোচনা করা যাবে না। তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কথা বলতে হবে, কোনোরূপ বেয়াদবী যেন প্রকাশ না পায়।

বিষয়টি এভাবে চিন্তা করুন। যদি আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্টের কোনো সন্তান মদ পান করে, কিংবা জিনা করে, আর সে যদি আপনার বাড়িতে বেড়াতে আসে, তাহলে আপনি তার সাথে কেমন আচরণ করবেন? নিশ্চয়ই তার সাথে আপনি অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করবেন, তাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। সে যেন আপনার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হয়, সেদিকে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। তাইনা? তাহলে, যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আহলুল কুরআন (উলামায়ে কেরাম)-গণ বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার খাস পরিবারভূক্ত লোক, তাহলে তাদের কোনো ভুল-ত্রুটি আমাদের গায়ে এত লাগে কেন? আসলে প্রকৃত ব্যাপার হলো, একজন প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্টের যে আযমত আমাদের দীলের মাঝে আছে, সেই পরিমাণ আযমত আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ কিংবা কুরআন কারীমের প্রতি নেই।

এ কারণে একজন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর ফাসেক পুত্রের প্রতি যে পরিমাণ সম্মান প্রদর্শন করি, একজন কুরআনের বাহক, আল্লাহর খাস পরিবারভূক্ত লোক কিংবা রাসূলের ওয়ারিশের প্রতি সেই পরিমাণ আযমত আমাদের দীলে নেই।

প্রকৃতপক্ষে, এটি উম্মতের ধ্বংসের একটি আলামত যে, তাদের অন্তর হতে উলামায়ে কেরামের আযমত উঠে গেছে।

তাই সাবধান, উলামায়ে কেরামের কোনোরূপ সমালোচনা না করা চাই। উলামায়ে কেরামের সংশোধনের ফিকির উপযুক্ত ব্যক্তিরা করবে। সাধারণ উম্মত নয়!

হ্যাঁ, যদি আপনার জানামতে এমন কোনো জায়গা থেকে থাকে, যেখানে উক্ত আলেম সম্পর্কে অবহিত করলে, তারা ঐ আলেমের সংশোধনের ফিকির করতে পারবে, সেক্ষেত্রে আপনি সেখানে ব্যাপারটি উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু অত্যন্ত আদবের সাথে। মনে রাখবেন, বেআদব আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর কখনোই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বিষয়টি আলোচনা করবেন না। এতে করে সাধারণ মানুষের অন্তরে উলামা বিদ্বেষ তৈরি হবে। ফলে তারা হক্কানী উলামায়ে কেরামকেও উলামায়ে ছু'দের মতো মনে করা শুরু করবে। কেননা তারা এই দুই শ্রেণির মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে না। যার ফলে তারা আলেমদের থেকে দূরে সরে যাবে। যিন্দেগীর কোনো বিষয়ে তারা উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। ফলে দ্বীন থেকে দূরে সরে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তাদের এই ধ্বংসের জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ভাই, আপনি তো আপনার লিখিত নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী (গরীব ইসলাম) কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আলেমদের অনেক সমালোচনা করেছেন, এই বিষয়ে কী বলেন?

সেখানে আমি কী লিখেছি, কেন লিখেছি, কী উদ্দেশ্যে লিখেছি, তা উলামায়ে কেরাম অবশ্যই বুঝেছেন। আমার উদ্দেশ্য কখনোই 'উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করা' ছিল না। আমি শুধু বুঝাতে চেয়েছি, সাহাবায়ে কেরামের ইসলাম থেকে আমরা কতটুকু দূরে সরে গিয়েছি! নবীওয়ালা ইসলামের সাথে আমাদের ইসলামের কতটুকু পার্থক্য!

আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দান করেছেন, সেই আলোকেই বিষয়টি পর্যালোচনা করেছি। আর পুরো বিষয়টি আমার এবং উম্মতের সম্মানিত উলামায়ে কেরামের মাঝেই সীমাবদ্ধ! এতে সাধারণ উম্মতের কোনো অংশ নেই। আমার লেখা পড়ে কেউ উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করবে, এই অধিকার আমি কাউকে দেইনি। যারা এমনটি করবে তাদের সাথে আমার কোনোরূপ দূরবর্তী সম্পর্কও নেই।

যেহেতু আমার এই কিতাবে উম্মতের সকল তবকার মুসলমানদের ইসলাহ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, হারানো নববী ইসলামকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে, আর উলামায়ে কেরাম হচ্ছেন উম্মতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই তাদের ভুল-ভ্রান্তির বিষয়টি এড়িয়ে গেলে আমার কিতাব কেবলই অসম্পূর্ণ নয়, হতো মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। তারপরও আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তাঁর কাছে উম্মতের সকল তবকার মুসলমানদের

সংশোধন কামনা করছি। আর আমার দীলের অবস্থা একমাত্র আমার প্রতিপালকই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে এভাবে চিন্তা করি, মাহমুদ সাহেব তার কিতাবে আমার কী কী ভুল চিহ্নিত করেছেন, আমি কী করছি, আর আমার এখন কী করা দরকার! কখনোই 'অন্যেরা কী করছে' সেদিকে না তাকাই।

তাবলীগী ভাইয়েরা আলেমদের দিকে না তাকাই, সালেকীন ভাইয়েরা আলেমদের দিকে না তাকাই, মুজাহিদ ভাইয়েরা আলেমদের দিকে না তাকাই, সাধারণ মুমিন ভাইয়েরা আলেমদের দিকে না তাকাই। প্রত্যেকের দৃষ্টি নিচের দিকে অর্থাৎ নিজের দিকে নিবদ্ধ রাখি। কেননা, হাশরের ময়দানে আমাকে অন্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, প্রত্যেককেই নিজেদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

পূর্বেও বলেছি, আবারো বলছি, কারো সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমরা উম্মতের ইসলাহ কামনা করি। আল্লাহর কসম আমরা উম্মতের ভালাই চাই। তাই কিতাবটি পাঠান্তে সমালোচনা নয়, আত্মসমালোচনা চাই; বিরোধিতা নয়, আত্মসংশোধন চাই; যুগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া নয়, যিন্দেগীর পরিবর্তন চাই; আর গাফলত নয়, এবার জাগ্রত হওয়া চাই, রণসাজে সজ্জিত হয়ে, "আল্লাহু আকবার" তাকবীর ধ্বনি তুলে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই।

-মাহমুদ আল হিন্দী

-উম্মতে মুহাম্মাদীর একজন 'নাদান' হিতাকাঙ্ক্ষী।

সাহাবাওয়ালা মেজাজ গড়তে..........

কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে সঠিক পথ দেখাতে.........

পৃথিবীর মানচিত্র ও ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে.........

উম্মতকে সাহাবাওয়ালা ঈমানী চেতনায় জাগ্রত করতে.........

আখেরী যামানার উম্মতকে নবুয়তের যামানায় ফিরিয়ে নিতে.......

সাহাবায়ে কেরামের জামাতের আদলে একটি নূরানী জামাত তৈরি করতে.......

এই কিতাবটি যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ!!!

-মাহমুদ আল হিন্দী

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের মূল শক্তি হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক (তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ্), আর তাদের মূল অস্ত্র হবে দুআ।

-মাহমুদ আল হিন্দী

উৎসর্গঃ

প্রথমত, আমার নফ্স-কে, কেননা কাউকে নসীহত করার মতো যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই, কেবল আমার নফ্স ছাড়া! সবচেয়ে বেশি নসীহতের মুহতাজ আমি নিজে।
হে নফস্! এই কিতাবের প্রতিটা শব্দ তোমার জন্য। তাই কিতাবটি ভালোভাবে বারবার পড়ো, কেননা এর উপর তোমাকে অবশ্যই আমল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যারা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী চিনতে চায়, গড়তে চায়, তাদেরকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী দান করুন। আমীন।

সূচিপত্র (তৃতীয় খণ্ড)

পঞ্চম গুণ

গুনাহমুক্ত যিন্দেগী গঠন করা

০৫. গুনাহমুক্ত যিন্দেগী গঠন করা

সাহাবায়ে কেরামের জামাত নিষ্পাপ ছিলো

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-কে সহযোগিতার জন্য এমন কিছু মহামানব নির্বাচন করেছিলেন, যারা ছিলেন নিষ্পাপ, গোনাহমুক্ত। তাঁরা আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তাআলা কখনো সেই হাত ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁদের উপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহ তাআলার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

প্রত্যেক যামানার মুসলমানদের জন্য করণীয় হচ্ছে, সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গঠন করে আল্লাহ তাআলার কালিমাকে বুলন্দ করা, যে কাজটি আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের জামাত দ্বারা নিয়েছেন।

(আলামতদৃষ্টে আমরা আশা করি) বর্তমান সময় ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যামানা। যদি বর্তমান সময় সেই যামানা নাও হয়, তবুও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদেরকে সকল প্রকার গুনাহ হতে পাক-পবিত্র করা। আর ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সঙ্গীদের জন্য এটি আরো জরুরী হবে। কেননা, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির দিক থেকে কুফ্ফাররা আমাদের চেয়ে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে। যদি প্রযুক্তি মাপা হয়, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সঙ্গীবর্গ এ পৃথিবীতে কিছুই করতে পারবেন না। আসলে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের জন্য এমন এক বাহিনী চাওয়া হচ্ছে, যে বাহিনীর মাঝে কোন কবীরা গুনাহ করনে ওয়ালা

থাকবে না, এমনকি সগীরা গুনাহ হতেও তারা সর্বোচ্চ পরহেয করনেওয়ালা হবেন। তাওবার দ্বারা তারা সকল গুনাহকে মাফ করিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট নিষ্পাপ সাব্যস্ত হবেন। যার ফলে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সাথীদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট হয়ে যাবেন। যদি এমন কোনো বাহিনী পৃথিবীতে থাকে, যারা অস্ত্রে-শস্ত্রে অত্যাধুনিক আর তারা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সহযোগী হতে চান, কিন্তু তারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করেননি, গুনাহমুক্ত হতে পারেননি, সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী আসেনি, তাদের এই অস্ত্র-শস্ত্র আল্লাহর সামনে কোনই কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের বাহিনী হিসেবে কবুল হতে পারবেননা। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু গুনাহমুক্ত, নিষ্পাপ মানুষকে তাঁর কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করবেন, যাদেরকে দুনিয়ার মানুষ হয়তো দুর্বল ভাবতো, অস্ত্রহীন ভাবত, কিন্তু গুনাহমুক্ত হওয়ায় তাঁরা আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক শক্তিশালী, অনেক কিছু। তারা দুনিয়ার লোভমুক্ত, খাহেশাতের দাসত্ব হতে মুক্ত, অধিক রাত্রি জাগরণ আর অল্প পানাহারের দরুন তাদের শরীরকে এত সুঠাম মনে হয়না, হালকা-পাতলা গড়নের আর অনেকের কাছে মনে হতে পারে 'আরে এ কি যুদ্ধ করবে, একে তো বাতাসেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে'। কিন্তু হাকীকত হচ্ছে, যার মাঝে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী পাওয়া যাবে, তাকেই আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করবেন, মাংশপেশীর দরকার হবে না। আপনার কি মনে হয়, সাহাবায়ে কেরামের শারীরিক কাঠামো কেমন ছিল? তাদের শারীরিক গঠন কি ফিল্মের নায়কদের মতো ষণ্ডামার্কা ছিল? কক্ষনো নয়। যারা চার-পাঁচ দিন

পর পর আহার করতেন, তাদের দৈহিক গঠন কখনোই মাংসল হতে পারেনা, নাদুস নুদুস হতে পারে না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, সকালবেলা সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে হেলেদুলে আল্লাহর যিকির করতেন, যেমন ঝড়ো বাতাসের দিনে গাছপালা দুলতে থাকে।

আমরা বুঝতে পারলাম, অবশ্যই শারীরিক শক্তি, সামরিক প্রশিক্ষণ, যুদ্ধের সরঞ্জাম, এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী আর সাহাবাওয়ালা বন্দেগী, তাঁদের যিন্দেগীর সাথে যিন্দেগী মিলানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এতে যদি শারীরিক দুর্বলতা পয়দাও হয়, সমস্যা নেই। হাকীকত হচ্ছে, যারা অল্প পানাহারে অভ্যস্ত, তারা দিনে একবার খেয়েও আদৌ কোনো দুর্বলতা অনুভব করেন না। কেননা যতটুকু দুর্বলতা তৈরি হবে, আর আল্লাহ তাআলার কাজ নেওয়ার জন্য যতটুকু শক্তির ঘাটতি থাকবে, ততটুকু ঘাটতি আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরতের দ্বারা পূরণ করা হবে। এটি আল্লাহ পাকের কুদরত যে, তার বান্দারা আল্লাহর জন্য কম খাবে, আর তিনি তাদের দেহকে দুর্বল হতে দেন না। আর তাই বেশি খেয়ে শারীরিক প্রশিক্ষণের চেয়ে, না খেয়ে মানসিক প্রশিক্ষণ নেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জানি, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের জন্য আল্লাহ পাক আসমান-জমীনের ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিবেন। তিনি দুই হাতে মানুষকে দান করবেন। কোনো হিসাব-নিকাশ করবেন না। তখন তো উম্মতের খাবার দাবারের অভাব থাকবে না, তাই এত কষ্ট করে কম খাওয়ার দরকার কী?

আচ্ছা! আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, এটি কি তাঁর প্রকাশ হওয়ার প্রথম দিনই হবে? যেদিন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, সেদিনই কি আল্লাহ পাক উম্মতের জন্য তার অসীম খাজানার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিবেন? না, তা হবে না। কেননা, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সকল বিষয় নবুওয়তের যামানার সাথে মিলাতে হবে, কারণ তার সকল বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানার সাথে মিল থাকবে। আল্লাহর রাসূলের জন্যও আল্লাহ পাক আসমান যমীনের ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সেটি কি নবুওয়তের প্রথম দিনই হয়েছিল? আপনাদের কি মাক্কী যিন্দেগীর কথা মনে নেই, যখন সাহাবায়ে কেরামের উপর নির্যাতনের স্টীম-রোলার চালানো হয়েছিল? আপনাদের কি 'শাবে তালীব' উপত্যকার কথা স্মরণ নেই, যখন সাহাবায়ে কেরাম বয়কট অবস্থায় তিন বছর গাছের পাতা খেতেন, ফলে তাদের মল ছাগলের বিষ্ঠার মতো গুটি গুটি হয়ে গিয়েছিল? এই যামানা আবারো আসছে....

যারা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী হওয়ার স্বপ্ন দেখি, তারা যেন ভালোভাবে 'না খেয়ে থাকার মশক' করে নেই। কেননা, খাজানা উন্মুক্ত হওয়ার আগে খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন আল্লাহর যিকির ছাড়া উম্মতের জন্য আহার করার মতো আর কোনো কিছু থাকবে না। তখন ক্ষুধার কষ্টে টিকে থাকা অনেক কঠিন হবে। ঈমান টিকিয়ে রাখাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। আর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত সকল গোনাহ থেকে পাক হওয়াও অসম্ভব!!! আধ্যাত্মিক সাধনার শুরু হয় ভুখা থাকা দ্বারা।

তাছাড়া আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের নিজেদের দুআগুলোকে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহাবাদের মতো কবুল করাতে চাই, সাহাবাদের যিন্দেগীর সাথে আমাদের যিন্দেগী মিলতে হবে। মোটকথা, সকল ক্ষেত্রে কামিয়াবীর শর্ত একটাই, স্লোগান একটাই,

যিন্দেগী চাই সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী,
দুনিয়ামুক্ত যিন্দেগী, গুনাহমুক্ত যিন্দেগী।

গুনাহের পরিচয় :

আল্লাহ তাআলার যে কোন হুকুম অমান্য করাকে গুনাহ বলে।

আর আল্লাহ তাআলার হুকুম দুই ভাগে বিভক্ত। ক. করণীয় আমল (যেমনঃ ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি) খ. বর্জনীয় কাজ (কুফুরী, শির্‌ক, মিথ্যা বলা, চুরি করা ইত্যাদি)

আল্লাহ তাআলা যা করতে বলেছেন, তা না করা আর যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করা, উভয়ই গুনাহ। যেমনঃ নামায না পড়া, মিথ্যা বলা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলার যত হুকুম আছে, তার কিছু কিছু সরাসরি আল্লাহ তাআলার হক (অধিকার), যাদেরকে ‘হুকুকুল্লাহ’ বলে, যেমনঃ ঈমান, নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত, আখলাক তথা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ও

চারিত্রিক বিষয়াবলি ইত্যাদি। আর কিছু হুকুম আছে যেগুলো বান্দার অধিকার আদায় করার সাথে সংশ্লিষ্ট, যাদেরকে ‘হাক্কুল ইবাদ’ বলে। বান্দার হকের মধ্যে প্রথমে আসে পুরুষের জন্য পিতা-মাতার হক, অতঃপর স্ত্রীর হক, এবং নারীর জন্য বিবাহের পূর্বে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক আর বিবাহের পর সর্বাগ্রে স্বামীর হক, এরপর পিতা-মাতার হক। অতঃপর নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সন্তানের হক, নিকটাত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক, সাধারণ মুসলমানদের হক, সাধারণ অমুসলমানদের হক, অন্যান্য জীব ও জড়বস্তুর হক ইত্যাদি। এগুলো মুআশারাত তথা সামাজিকতার অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও আছে, মুআমালাত তথা লেনদেন, রোজগার, চুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ইত্যাদি। এই সকল হক নষ্ট করাও গুনাহ। এগুলোর ইলম হাসিল করা জরুরী।

আল্লাহ তাআলার হক ও বান্দার হকের মধ্যে বান্দার হক বেশি মারাত্মক, কেননা আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট হলে ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক নষ্টকারীকে আল্লাহ তাআলা কখনোই ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না বান্দা তা ক্ষমা করে।

গুনাহ দুইভাবে সম্পাদন হয়ে থাকে।

এক. বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সংগঠিত গুনাহ। প্রধান অঙ্গ মোট আটটি যেগুলো দিয়ে গুনাহ সম্পাদিত হয়, যথা: জিহ্বা, চোখ, কান, নাক, পেট, লজ্জাস্থান, হাত ও পা।

দুই. অন্তর দ্বারা সাধিত গুনাহ। অন্তরের কিছু গুনাহ আছে যেগুলো ঈমান বিধ্বংসী, যেমন কুফুরী, শিরকী, বিদআতী ইত্যাদি ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করা। এসব গুনাহের দ্বারা মানুষ ইসলাম হতে বের হয়ে যায়। এছাড়া অন্তর দ্বারা সম্পন্ন হয় এমন গুনাহ প্রধানত দশ প্রকার যেগুলো করলে মানুষ কাফের/মুরতাদ হবে না কিন্তু গুনাহে কবীরা হবে এবং পরকালে জাহান্নামী হবে, যথাঃ দুনিয়ার মোহ, কিবির তথা অহংকার, রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি, হাসাদ তথা হিংসা, পদের লোভ, ধন-সম্পদের মহব্বত, আত্মশ্লাগা বা খোদপছন্দী, ক্রোধ, ভোজনস্পৃহা, কাম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

পাপকাজ পরিহার করঃ

ওহে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ পাকের সামনে তাঁর কোনো নাফরমানী করো না। তুমি যদি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পাপকাজে লিপ্ত হও, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, খোদ আল্লাহ পাকের দেওয়া বিরাট নিয়ামত ও অবদানকে তুমি তাঁরই বিরুদ্ধে অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার করছ। এটা নিয়ামতের চরম অকৃতজ্ঞতা এবং আমানতের চরম খেয়ানত। অথচ তোমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তোমার জন্য প্রজা স্বরূপ। সুতরাং অধীন হিসেবেই সেগুলোকে ব্যবহার করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "বস্তুতঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, "প্রকৃত মুহাজির সে, যে পাপকার্য ত্যাগ করেছে, আর প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করেছে।" (আহমাদ)

মনে রেখো, তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিয়ামতের ময়দানে সুস্পষ্ট ভাষায় তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এতে বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে তোমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"সেদিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।" (২৪ সূরা আন্ নূর:২৪)

তিনি আরও বলেন,

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

"আজ আমি তোমাদের মুখে সীল মেরে মুখ বন্ধ করে দিব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন: ৬৫)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

"তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না-এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।

তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছ।” (৪১ হা-মীম সিজদাহ: ২০-২৩)

অতএব, হে অসহায়! তোমার মন ও সমগ্র দেহকে আল্লাহর না-ফরমানী থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

“চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় (কুচিন্তা) তিনি জানেন।”

(৪০ আল-মু’মিন: ১৯)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ থেকে বাঁচা

চোখের হেফাযত:

তোমাকে চোখ দেওয়া হয়েছে, যাতে এর দ্বারা তুমি দেখে পথ চলতে পার, তোমার বহুবিধ প্রয়োজন মিটাতে পার, আকাশ-পৃথিবীর যাবতীয় আশ্চর্য বিষয় এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন দেখতে পার, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে পার এবং এর দ্বারা নসীহত হাসিল করতে পার। অতএব, তোমার চক্ষুকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখ:

- ✓ গায়রে মাহরাম মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হতে বিরত থাক।
- ✓ কোনো সুন্দর চেহারার প্রতি (যেমন: অজাতশ্মশ্রু বালক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রতি) কামাতুর দৃষ্টিতে তাকিও না।
- ✓ কোনো মুসলমানকে ঘৃণার চোখে দেখো না।
- ✓ কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না।

মনে রেখ, যিনা করার ইচ্ছা চোখ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "শয়তানের তীরসমূহের মাঝে চক্ষু-দৃষ্টি একটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয়ে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন পরিপক্ক ঈমান দান করেন, যার মিষ্টতা সে নিজের অন্তরে অনুভব করে থাকে।"

চোখের হেফাজতের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো স্মরণ রেখো:

- যার দিকে তাকালে মনে কুচিন্তা আসে, ভালো লাগে, চুমো দিতে ইচ্ছে হয়, যাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে, সাহচর্য বা সঙ্গলাভ অবলম্বন করতে ইচ্ছে হয়, কথা বলতে মনে চায়, কামভাব নিয়ে মুআনাকা বা মুসাফাহা করতে ইচ্ছে করে, অন্তরঙ্গতা তৈরি করতে আকাঙ্ক্ষা হয়, যার বিচ্ছেদে মন অস্থির হয়ে যায়, সঙ্গমসুখ লাভ করতে উন্মাদনা তৈরি হয়, এরকম যত মানুষ আছে, এরকম যত গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড আছে, এদের থেকে পলায়ন কর। এরা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন। এরা তোমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কে বরবাদ করবে। এরা তোমার জন্য শয়তানের হাতিয়ার। সে এদের মাধ্যমে তোমাকে জাহান্নামে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে। মনে রেখ, এরা তোমার জন্য আগুন, জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা!!!
- নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "গুপ্তাঙ্গের ন্যায় চোখও যিনা করে থাকে।" কামভাবের সাথে দৃষ্টিপাত করাই চোখের যিনা।"
- যেদিকে তাকালে চোখের গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেদিকে তাকিও না। যেমন: রাস্তায় হাঁটার সময় চোখ নত রাখ, এতটুকু উঁচু করা যাবে না, যাতে মানুষের চেহারার উপর চোখ পড়ে যায়, আবার এতটুকু নীচুও করা যাবে না, যাতে গাড়ি কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়। আবার যদি কারোর

বাড়ির দিকে তাকালে সেখানে মহিলা চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সেদিকে তাকাবে না।

- যে স্থানে গেলে চোখের গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে স্থানে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া যাওয়া থেকে বিরত থাক। যেমন: মার্কেট, বিয়ে বাড়ি, পার্ক, পার্টি, মেলা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি।
- চোখের গোনাহ হতে পারে এমন উপকরণ থেকে দূরে থাক। যেমন: স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মুভ্যি, পর্নগ্রাফী, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকেও নিজেকে বাঁচাও।
- নিচের কথা গুলো মনে রেখো-

✓ যারা গার্লফ্রেন্ডদের দিকে তাকিয়ে মজা লয়, মৃত্যুর পর এদের চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

✓ যারা মোবাইল বা কম্পিউটারে অশ্লীল মুভ্যি, কিংবা পর্নগ্রাফী দেখবে, মৃত্যুর পর এদের চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

✓ যারা রাস্তা ঘাটে পথের সুন্দরীদের দেখে মজা লুটবে, মৃত্যুর পর এদের চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

✓ যারা পর্দা করবে না, নিজের ভাবী, চাচী, শ্যালিকা ইত্যাদি গায়রে মাহরাম নারীদের সামনে যাবে, মৃত্যুর পর এদের চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

✓ আর হাশরের বিচারে এদের জন্য জাহান্নাম ফয়সালা করা হবে। কত নিকৃষ্ট স্থান সেটি!!! কত ভয়াবহ আগুন সেটি!!! শাস্তি হিসেবে কতই না ভয়ঙ্কর সেটি!!! তাই সাবধান, চোখের হেফাযত কর।

কানের হেফাযত:

তোমার কানকে গান-বাজনা, বিদআত, গীবত, অশ্লীলতা, বাতিল ও অহেতুক আলোচনা, কারো পাপের কাহিনী ইত্যাদি শোনা থেকে হেফাযত কর। কেননা তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় বা কান সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর কালাম (কুরআন কারীম), রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস এবং আল্লাহওয়ালাদের হিকমতপূর্ণ বাণী শ্রবণ করার জন্য। এর সাহায্যে ইলম হাছিল করে তুমি মহান রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন নেয়ামত ও অনাবিল সান্নিধ্য লাভ করবে। এই কানকে তুমি গোনাহের কাজে ব্যবহার করো না। যদি তুমি তোমার কানকে আল্লাহর অবাধ্যতার কথা শোনার জন্য ব্যবহার কর, তাহলে যে কান তোমার জন্য কল্যাণকর এবং সাহায্যকারী হওয়ার কথা ছিল, সেই কান তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং যা তোমার নাজাতের কারণ হতে পারত, সেটাই তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটা তোমার জন্য মারাত্মক ক্ষতি। তুমি কখনো একথা মনে করো না যে, গুনাহ কেবল বক্তারই হয়ে থাকে; এতে শ্রোতার কোনো অংশ নেই। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, "বক্তার সাথে শ্রোতাও পাপের অংশীদার এবং সে-ও বক্তার মত গীবতকারী হিসাবে গণ্য।" (তাবরানী)

মনে রেখ-

- ✓যারা গান-বাজনা শুনবে, মৃত্যুর পর এদের কানে গলিত সীসা ঢেলে আযাব দেয়া হবে।
- ✓যারা অশ্লীল কথা শুনবে, মৃত্যুর পর এদের কানেও গলিত সীসা ঢেলে আযাব দেয়া হবে। সুতরাং সাবধান!!!

জিহ্বার হেফাযত:

তোমার জিহ্বা বা বাকশক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে সর্বদা তুমি আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত হতে পার, তাঁর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করতে পার, আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আহ্বান করতে পার এবং এই জিহ্বার সাহায্যে ধর্মীয় এবং পার্থিব বিষয়াবলি ব্যক্ত করতে পার। পক্ষান্তরে, এই জিহ্বাকে যদি আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার কর, তাহলে প্রকারান্তরে আল্লাহর নেয়ামতকে তুমি অস্বীকার করলে। মনে রেখো, জিহ্বার অপব্যবহারই মানুষকে মুখ নীচে-পা উপরে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। সুতরাং তোমার জিহ্বাকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ কর।

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "হাস্যচ্ছলে কোনো সময় বে-মালুম এমন কথাও মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, যা তাকে সত্তর বৎসরের জন্য জাহান্নামের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবৎকালে একজন মুসলমান জিহাদে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; এতে একজন সাহাবী মন্তব্য করেছিলেন 'সে জান্নাতে যাবে'। এ কথা শুনে হুযুর ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কী করে জানলে, সে জান্নাতে যাবে? এমনও তো হতে পারে যে, সে অহেতুক কথাবার্তা বলতো এবং তার স্বার্থ নেই এমন বিষয়ে কৃপণতা করতো।" (তিরমিযী)

নবীজী ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি জিহ্বাকে শাসনে রাখতে পেরেছে, সে মুক্তি লাভ করেছে।"

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ পাক যে ব্যক্তিকে পেট, কামেন্দ্রিয় এবং জিহ্বার আপদ হতে রক্ষা করেছেন, সে যাবতীয় আপদ হতে সুরক্ষিত হয়েছে।"

নবীজী ﷺ আরেকদিন বললেন,"কম কথা বলে এরূপ কোনো গম্ভীর ও চিন্তাশীল মুসলমানকে দেখতে পেলে তোমরা তার সঙ্গ ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো, এরূপ স্বভাবের লোক কখনই হেকমতশূন্য হতে পারে না।"

একদিন হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু দেখলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লহু আনহু হাত দিয়ে জিহ্বাকে টানছেন এবং কচলাচ্ছেন। হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি এরূপ করছেন কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "এই জড়পিণ্ডটি আমাকে বহু বিপদে ফেলেছে।"

জিহ্বার আপদ থেকে বাঁচার জন্য হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু মুখে পাথর পুরে রাখতেন, যেন অসতর্কতাবশতঃ মুখ লাগামহীন হয়ে না যায়। যখন কথা বলার প্রয়োজন পড়ত, চিন্তা-ভাবনা করে, মুখ থেকে পাথর বের করে কথা বলতেন।

এ থেকেই বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ মুখের ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন!!!

তাই মুখের সমস্ত আপদগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা আবশ্যক মনে করছি।

জিহ্বার প্রথম আপদ: অনর্থক কথা বলা

যে কথার দ্বারা মানুষের ধর্মীয় বা দুনিয়াবী কোনো ফায়দা নেই, তাই অনর্থক বা বেহুদা কথা। এ ধরণের কথার দ্বারা মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য থেকে দূরে সরে যায়। আর ইসলামের সৌন্দর্যই হচ্ছে নিরহঙ্কারপূর্ণ গাম্ভীর্যের মধ্যে।

মনে রেখো, যে ক্ষেত্রে মনোভাব প্রকাশের জন্য একটি শব্দই যথেষ্ট ছিল, সেক্ষেত্রে দুইটি শব্দ ব্যবহার করলে দ্বিতীয়টি অনর্থক বা অনাবশ্যক কথা হিসেবে গণ্য হবে, আর এজন্য তোমাকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

এ ধরণের অনর্থক কথার দৃষ্টান্ত হলো- তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছ আর তোমার দেশ ভ্রমণের কাহিনী, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলের অবস্থা, সে সময় তোমার কী কী অবস্থা হয়েছিল, কী কী ঘটেছিল, যা কিছু দেখেছ আর যা কিছু শুনেছ, সব ঠিক ঠিক বলছ, কোনো কম-বেশ করছ না। আজ ক্লাসে কী কী ঘটল, অফিসে কী কী হলো, এসব আলাপ-আলোচনা, সবই অপ্রয়োজনীয়। এর দ্বারা কারো কোনো ফায়দা নেই। তোমার এ জাতীয় প্রতিটি কথাই অনর্থক।

তারপর মনে কর, খেলাধুলা সংক্রান্ত যত আলোচনা আছে, যেমন ফুটবল, ক্রিকেট বিশ্বকাপ, টুয়েন্টি-টুয়েন্টি, কোন্ খেলোয়াড় সে-ই খেলেছে, কে বাজে খেলেছে, কেমন খেলা উচিত ছিল ইত্যাদি, এগুলো সবই অনর্থক কথা। এগুলোর দ্বারা তোমার চেহারার নূর নষ্ট হয়ে যাবে।

আরো ধর, রাজনৈতিক আলোচনা, বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু, যেগুলো আলোচনা করার দ্বারা না তুমি সমাজকে বদলাতে পারবে, না পৃথিবীর কোনো মানুষের কোনো ফায়দা হবে, এসবই

অনর্থক। তবে হ্যাঁ, যেসব বিষয়ে উম্মতের স্বার্থ জড়িত, যেসব আলোচনা দ্বারা উম্মতের প্রতি মহব্বত, জিহাদী জযবা পয়দা হয়, সেগুলো অনর্থক নয়।

মা-বোনদেরকে দেখা যায়, দুই-তিনজন একসাথে হলেই আলোচনা শুরু করে দেয়, কার স্বামী কেমন, কার কোন্ সন্তানটা কী করে, কী তাদের অর্জন, কার কোন্ বিষয়ে কী কী পছন্দ-অপছন্দ, কার কোন্ আত্মীয়ের কী সমস্যা, কার কী অসুখ-বিসুখ, কার সংসার কেমন চলে ইত্যাদি, ইত্যাদি, এগুলোর কোনোই প্রয়োজন নেই। এ সবই অনর্থক।

মনে কর, তোমার বন্ধুকে দেখে বললে, বন্ধু! কোথা থেকে আসছ? কী কর? কী করছিলে? কোনো পথিক বা অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে- ভাই কী কাজ করেন, কোথায় থাকেন, বিদায় নেয়ার সময় বললে, ভাই, আপনাকে কষ্ট দিলাম; এগুলো সব বেহুদা কথা। অনেক সময় এ সকল কথা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বিপদে ফেলা হয়। হয়ত সে বলতে চাচ্ছে না- সে কোথা থেকে এল, কী করছে, কী করছিল, কী কাজ করে ইত্যাদি, কিন্তু তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করায় সঠিক জবাব দিলে হয়ত তার ক্ষতি হবে, বা সে হীনমন্য হবে, আবার ঘুরিয়ে জবাব দিলে মিথ্যা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তোমার একটা অনর্থক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একজন মুসলমান গোনাহে কবীরা করে ফেলল। এর জন্য তো তুমিই দায়ী। তাই এ ধরণের কথা থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরহেয করা চাই।

মানুষ এ ধরণের কথা মূলত তিন কারণে বলে থাকে। (ক) লোকের অবস্থা অবগত হওয়া, (খ) পথিক বা অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলার

পরিবেশ তৈরী করা, আর (গ) এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ ও আলোচনার দ্বারা তার প্রতি নিজের অনুরাগ ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করা। এসব না করা চাই।

এসব কথা ও কাজ সবই অপ্রয়োজনীয়। এর দ্বারা সময় নষ্ট হয়। ইসলামের নূর খতম হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে দূরত্ব পয়দা হয়। এ সময়টা যিকির ও তিলাওয়াত করলে অনেক ফায়দা হতো। মনে রাখবে, তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। তাই নির্জনতা অবলম্বন কর। আড্ডাবাজি পরিহার কর। দ্বীনী কথা বল, নয়তো চুপ থাক।

জিহ্বার দ্বিতীয় আপদ: অন্যের কথার প্রতিবাদ করা

কারো কারো মাঝে এমন অভ্যাস আছে যে, কারো একটা কথা শুনামাত্র সাথে সাথে প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, এটি এমন নয়। এইভাবে প্রতিবাদের মাধ্যমে কথা কাটাকাটি করে ঝগড়া বিবাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। এ প্রতিবাদের অর্থ এই যে, "তুমি আহমক, নির্বোধ এবং মিথ্যাবাদী আর আমি চতুর, জ্ঞানী এবং সত্যবাদী।" এ ধরণের প্রতিবাদ দ্বারা সে বুঝাল যে, তার ভিতর অহংকার এবং ঈর্ষা-বিদ্বেষ নামক ভয়ানক এবং সর্বনাশা দুটি ব্যাধি আছে। এছাড়াও এ ধরণের কথার দ্বারা অন্য ভাই/বোনকে কষ্ট দেয়া হয়, তাকে ছোট করা হয়; যা স্বতন্ত্র একটি হারাম ও গোনাহে কবীরা। হ্যাঁ, প্রতিবাদ না করলে যদি ঐ বক্তার কিংবা উম্মতের ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে প্রতিবাদ বৈধ। আর যে ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করলে সংশোধনের পরিবর্তে ঝগড়া-ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই অন্যের কথার প্রতিবাদ বা ভুল ধরা যাবে না, চাই দ্বীনী বিষয়েই হোক, কিংবা দুনিয়াবী বিষয়েই হোক।

ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। যদি কারো সাথে ঝগড়া বেধেই যায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যে কোনো ভাবেই হোক যেন ঝগড়া এড়ানো যায়। একান্ত সম্ভব না হলে সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথা বলা উচিত নয়। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মনে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করবে না। কর্কশ এবং অতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ করবে না। নাহলে তোমার দ্বীনদারীর যিন্দেগী ধ্বংস হয়ে যাবে।

࿓ জিহ্বার তৃতীয় আপদ: অশ্লীল গালি-গালাজ করা

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি অশ্লীল ভাষায় কথা বলে তার জন্য জান্নাত হারাম।" তিনি আরো বলেন,"জাহান্নামের মাঝে কিছু লোক এমন থাকবে যাদের মুখ দিয়ে মল-মূত্র বের হতে থাকবে এবং এর দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে অন্যান্য দোযখবাসীরা অভিযোগ করে জিজ্ঞাসা করবে 'এরা কেমন লোক? তাদের এই অবস্থা কেন?' উত্তর আসবে,"এরা সে সমস্ত লোক যারা পৃথিবীতে অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসত এবং অশ্লীল গালিগালাজ করত।"

মনে রেখো, নারী-পুরুষের অবৈধ মিলন সংক্রান্ত বিষয়ের বিকৃত ও কদর্য বিশ্লেষণ থেকেই অধিকাংশ অশ্লীল কথার উৎপত্তি হয়ে থাকে। আর অশ্লীল বিষয়ের প্রতি কাউকে সম্পৃক্ত করাকেই গালি-গালাজ বলে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে গালি-গালাজ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়।" উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন কাজ কে করবে?" অর্থাৎ এমন নরাধম কে আছে যে নিজের পিতামাতাকে গালি দিতে পারে?

হুযুর ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি অপরের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং তার উত্তরে প্রতিপক্ষও তার পিতা-মাতাকে গালি দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি যেন নিজেই নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিল।"

জিহ্বার চতুর্থ আপদ: কাউকে অভিশাপ দেওয়া বা বদ দোআ করা

আল্লাহর যে কোনো সৃষ্টির প্রতি (যেমন: মানুষ, পশুপাখি, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদিকে) বদ-দোআ করা থেকে তোমার জিহ্বাকে সংযত কর। যদি কেউ তোমার উপর যুলুম করে তবে বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দাও। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "মজলূম ব্যক্তি জালিমের বিরুদ্ধে বদ-দোআ করলে জুল্‌মের প্রতিশোধ পূরণ হয়েও জালিমের অতিরিক্ত হক পাওনা হয়ে যায়, যা কিয়ামতের দিন মজলূমের নিকট হতে জালিম ব্যক্তি উসূল করবে।"

জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজের (কুখ্যাত জালেম) বিরূপ সমালোচনা করলে এক বুযুর্গ বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা জুলম-অত্যাচারের কারণে যেমন হাজ্জাজের প্রতিশোধ নিবেন, তেমনি হাজ্জাজের প্রতি কেউ জুল্‌ম বা যবান-দরাযী করলে সেটারও বিচার করবেন।"

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখবে-

- যারা অভিশাপের উপযুক্ত এমন জাতিকে সাধারণ ভাবে অভিশাপ দেয়া যায় বা বদ দোয়া দেয়া যায়। যেমন: "যালেমদের, চোরদের,

কাফেরদের, ব্যভিচারীদের ও ধর্মদ্রোহীদের, নাস্তিকদের, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলনকারী ক্রুসেডারদের প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক।"

- তবে এ ধরণের কর্মে লিপ্ত নির্দিষ্ট কোনো 'জীবিত' ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লা'নত করা যাবে না। কেননা হতে পারে সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে নিবে।

- মৃতদের ক্ষেত্রে, যাদের কুফুরী বা শেরেকী কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমানিত, তাদেরকে লা'নত করা যায়। যেমনঃ ফিরাউন, আবু জেহেল, আবু লাহাব ইত্যাদি। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়নি, তাদেরকে অভিশাপ দেয়া যাবে না। হতে পারে, মৃত্যুর পূর্বে সকলের অলক্ষ্যে সে ঈমান এনেছিল।

- কোনো মুসলমানকে অভিশাপ/বদ দোআ দেয়া তাকে হত্যা করার গোনাহের শামিল।

- মনে রেখো, সারা জীবনে যদি একবারও শয়তানকে লা'নত না করা হয়, তাতে আল্লাহ পাক তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে, তুমি কেন তাকে লা'নত কর নাই। কিন্তু অন্য কোনো মাখলূককে একবার লা'নত করলে তোমাকে ময়দানে হাশরে অবশ্যই আটকে দেয়া হবে। তাই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া মুখ দিয়ে কারো প্রতি যেন বদ দোআ/লা'নত ভুলেও না বের হয়। আর শয়তানকে লা'নত করাও অনর্থক কাজের মধ্যে গণ্য। কেননা এতে কারো কোনো ফায়দা বা সওয়াব নেই, বৃথাই সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময়টা তাসবীহ-তাহলীল আর আল্লাহর ইবাদতে কাটাও, তাতে অনেক ফায়দা হবে। এতেই শয়তান বেশি কষ্ট পাবে।

৻ জিহ্বার পঞ্চম আপদ: কবিতা পাঠ করা বা সাহিত্য সমালোচনা করা

ইসলামী সঙ্গীত, হামদ, নাত যদি বাজনা ছাড়া হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। কাব্যচর্চা হারাম নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম নবীজী ﷺ-কে কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। তিনিও তা শুনতে পছন্দ করতেন। তিনি নিজেই আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দাও, এতে তাদের ভাষায় মাধুর্য তৈরি হবে।

তাহলে সমস্যা কোথায়? মিথ্যা বা লজ্জাকর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গল্প ও অন্যান্য সাহিত্য পাঠ বা আলোচনা করা জায়েয নেই। এতে অন্তর বক্র ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্তরে ইল্‌ম ও আল্লাহর মারেফাতের নূর পয়দা হয় না। ফলে এরা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ কারণেই সাহিত্যের অধিকাংশ ছাত্ররা নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যায়।

অবশ্য যে সমস্ত কবিতা বা গল্প তুলনা বা উপমামূলক, সে সমস্ত কবিতা বা গল্প কল্পিত হলেও তা রচনা বা পাঠ করা হারাম নয়। কেননা এটিই সাহিত্যের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। আবার সাহিত্যের বাহ্যিক মর্মই পাঠক গ্রহণ করুক, অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য তা থাকে না। এ ধরণের উপমামূলক কবিতা আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেও শুনেছেন।

৻ জিহ্বার ষষ্ঠ আপদ: হাস্য-কৌতুক করা

প্রিয় নবীজী ﷺ সর্বদা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতুক করতে নিষেধ করেছেন। মাঝে মধ্যে যৎসামান্য কৌতুক বা খোশ-মেজাজী করা নিষিদ্ধ নয়, বরং এটি সৎস্বভাবের অন্তর্গত বলেই ধরে হয়, কিন্তু এটিকে স্থায়ী

অভ্যাসে পরিণত করা অন্যায়। কখনো হাসি-ঠাট্টা বা কৌতুক করতে হলে তাতে সত্য ভিন্ন মিথ্যা ব্যবহার করা জায়েয নেই। অধিক হাসি মানুষের দীলকে মেরে ফেলে, ইসলামের সৌন্দর্য 'নিরহঙ্কারপূর্ণ গাম্ভীর্য'-কে নষ্ট করে দেয়, মান-সম্মান কমিয়ে দেয়। মানুষের কাছে তার ব্যক্তিত্বের কোনো ওজন থাকে না। অনেক সময় হাসি-ঠাট্টার কারণে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,"আমিও মাঝে মাঝে হাস্য-কৌতুক করি, কিন্তু সত্য কথা ভিন্ন অন্য কিছু বলি না।" যেমন, একদিন নবীজী ﷺ এক বৃদ্ধ মহিলাকে তার কষ্ট লাঘবের জন্য কৌতুক করে বললেন,"বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" একথা শুনে বৃদ্ধা মহিলা কান্না শুরু করে দিল। বৃদ্ধার কান্না দেখে নবীজী ﷺ বললেন, "ওহে বৃদ্ধা! তুমি হতাশ হয়ো না। আল্লাহ তোমাকে প্রথমে যুবতী বানাবেন, এরপর বেহেশতে দিবেন।" নবীজীর ﷺ কথা শুনে এবার বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "অপরকে হাসানোর জন্য কেউ কেউ হাস্যোদ্দীপক কথা বলে থাকে, কিন্তু তা দ্বারা সে নিজের মর্যাদাকে আকাশ-পাতালের দূরত্ব অপেক্ষাও অধিক নীচে নামিয়ে দেয়। যে জিনিস অধিক হাস্যোদ্দীপক, তা অতিশয় নিকৃষ্ট। মুচকি হাসি অপেক্ষা অধিক উচ্চ রবে হাস্য করা সঙ্গত নয়।"

প্রিয় নবীজী ﷺ আরো বলেন, "যা কিছু আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে পারতে, তবে অতি অল্প মাত্রায় হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কান্না করতে।"

✾ জিহ্বার সপ্তম আপদ: উপহাস ও ব্যাঙ্গোক্তি

অপরের কণ্ঠস্বর এবং চাল-চলনের অনুকরণ করে তার অনুরূপ কথা বলা এবং ভাব-ভঙ্গি অন্যদের সামনে প্রদর্শন করা, যাতে সকলের হাসি পায়, আর যাকে ব্যাঙ্গ করা হলো সে কষ্ট পায়, এরূপ করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। বিচিত্র নয়, হতে পারে বিদ্রুপকৃত ব্যক্তিরা (আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে) তাদের (বিদ্রুপকারীদের) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" (সূরা হুজুরাত: ১১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "কোনো পাপকাজ হতে তওবা করার পর যদি কেউ ঐ ব্যক্তিকে তার সেই পাপ কাজ উল্লেখ করে দুর্নাম করে, তবে দুর্নামকারী উক্ত পাপে জড়িত না হয়ে মরবে না।"

কোনো ব্যক্তির সশব্দ বাতকর্মের জন্য হাসি-ঠাট্টা করতেও নবীজী ﷺ নিষেধ করে বলেছেন, "যে কাজ মানুষ নিজেও করে, সে কাজের জন্য অপরকে ঠাট্টা করবে কেন?"

তবে, মনে রেখ! যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে, সে কখনোই মনক্ষুন্ন হবে না, সেক্ষেত্রে হাস্য-কৌতুক করা নাজায়েয নয়। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলেও তা জায়েয হবে না। মনে রাখতে হবে, অনেক মানুষ এমন আছে, যে মুখে বলে কষ্ট পাই নি, কিন্তু মনে মনে ঠিকই কষ্ট পায়। তাই সর্বোত্তম হলো, এমনটি না করা।

জিহ্বার অষ্টম আপদ: মিথ্যা ওয়াদা

ওয়াদা করে যাতে সে ওয়াদা ভঙ্গ করতে না হয়, সে বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে। কারো কোনো উপকার করতে হলে, চেষ্টা করবে কথার মাধ্যমে ওয়াদা না করে বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তা করতে। একান্তই যদি কাউকে কোনো ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হও, তাহলে এভাবে বল, "সম্ভবত আমি এটি করতে পারবো, আল্লাহ পাক যদি চান।" আর নেহায়েত অপারগতা ও অসামর্থ্য ছাড়া কিছুতেই যাতে ওয়াদা ভঙ্গ করতে না হয়, সে ব্যাপারে তীব্র সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা, ওয়াদার বরখেলাফ করা মুনাফেকী ও হীনচরিত্রের লক্ষণ। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "তিনটি অভ্যাস যার ভিতর আছে, সে মুনাফিক; যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে: মিথ্যা বলা, ওয়াদার বরখেলাফ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা (গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করা)।"

এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত হলো এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে অমুক জায়গায় উপস্থিত হবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে ভুলে গেল। তিনদিন পর তার স্মরণ হলে সে দৌঁড়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যে, নবীজী ﷺ সেখানে তিন দিন যাবৎ সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মনে রেখ, কারো সঙ্গে কোনো স্থানে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত সে স্থানে প্রতীক্ষা করা কর্তব্য।

আর নিতান্ত ঠেকাবশতঃ চেষ্টায় ত্রুটি না হওয়া সত্ত্বেও ওয়াদার খেলাফ হলে গোনাহ হবে না।

❁ জিহ্বার নবম আপদ: মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করা

সর্বাবস্থায় মিথ্যা বলা থেকে তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ। এটি মুনাফেকীর তিনটি আলামতের একটি। আন্তরিকভাবেই হোক আর কৌতুচ্ছলেই হোক, কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নিবে না; এমনকি কৌতুকের বশেও তোমার জিহ্বাকে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত করবে না। কেননা, হতে পারে তোমার এই অভ্যাস আন্তরিকভাবেও তোমাকে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করবে। মনে রেখো, মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম উৎস। তুমি যদি মিথ্যুক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাও, তাহলে তোমার সততা তথা সর্ববিষয়ে তোমার নির্ভরযোগ্যতা মানুষের দৃষ্টিতে বিক্ষত হয়ে যাবে। তোমার কথা বা বিবরণ কারো কাছে গৃহীত হবে না। ইসলামী আদালতে তোমার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। সকলেই তোমাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "মুসলমান কখনোই মিথ্যা বলতে পারে না।"

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

"নিশ্চয়ই যাদের ঈমান নেই, কেবল তারাই মিথ্যা কথা বলে থাকে।"
(সূরা নাহল: ১০৫)

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, মেরাজের রাত্রিতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে বললেন, একটু দাঁড়ান। আমি দাঁড়ালাম। এক কবরস্তানে দুই জন লোককে দেখতে পেলাম, একজন

দণ্ডায়মান এবং আরেকজন উপবিষ্ট। যে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে বাঁকা মাথাবিশিষ্ট একটি লোহার শলাকা ছিল। সে এটিকে যে বসে আছে তার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে তার একদিকের চোয়ালে লাগিয়ে এমন জোরে টান দিল যে, চোয়ালটি তার কাঁধ পর্যন্ত ফেঁড়ে এসে পড়ল, পুনরায় অপর দিকের চোয়ালে লাগিয়ে একইভাবে টান দিল যে, চোয়ালটি তার অপর কাঁধ পর্যন্ত ফেঁড়ে চলে গেল এবং প্রথম চোয়ালটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। বার বার সে এমনটি করতে থাকল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তিটি কে? (যাকে এমন শাস্তি দেয়া হচ্ছে?) উত্তর আসল, 'মিথ্যাবাদী'। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "মানুষ যখন মিথ্যা বলে ফেরেশতাগণ তখন তার মুখের দুর্গন্ধে তার থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়।"

প্রিয়নবী ﷺ আরো বলেন, "কোনো লোকের নিকট হতে মিথ্যা কথা শোনে তা আরেকজনের কাছে বর্ণনা করাও মিথ্যা বলারই অন্তর্গত।" তাই কারো কাছে কোনো তথ্য শুনার পর তার সত্যতা যাচাই না করে, ভুলেও তা অন্যের নিকট বর্ণনা করবে না।

মিথ্যা কথা বলার দ্বারা অন্তর বক্র ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ভয়ঙ্কর ও বিভৎস রূপ ধারণ করে। অন্তরে ইল্‌ম ও আল্লাহর মারেফাতের নূর পয়দা হয় না। ফলে এরা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অবশেষে তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে। নাউযুবিল্লাহ।

মনে রেখ- নিম্নের মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন।

১. জিহাদের ময়দানে দুশমনদেরকে নিজেদের সত্য পরিকল্পনা না জানিয়ে মিথ্যার আবরণে গোপন রাখা। কেননা তিনি বলেছেন, যুদ্ধ হচ্ছে ধোকাবাজি বা কৌশলের নাম।

যুদ্ধবন্দী অবস্থায়ও আপন বাহিনীর কোনো পরিকল্পনা বা অবস্থার কথা বলবে না, তাতে যদি জীবনও চলে যায়, যাক।

২. বিবাদমান দুই মুসলমানের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য একপক্ষের হয়ে অপরপক্ষের কাছে প্রিয় ও উত্তম কথা শুনাবে, যদিও তা বানোয়াট হয়। কেননা এক ব্যক্তির মিথ্যার চেয়ে মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হওয়া বেশি ক্ষতিকর।

৩. কোনো পুরুষের দুই স্ত্রী থাকলে উভয়কেই বলবে, আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, যদিও তা ভুয়া হয়। কেননা এর দ্বারা অনেক ফেতনার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া যার এক স্ত্রী আছে, সেও তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতে মাঝে মধ্যে মিথ্যা বলতে পারে, তাতে সমস্যা নেই।

৪. যালেমের হাত হতে মুসলমানের যান-মালের হেফাযতের জন্য যালেম যদি সে মুসলমানের সন্ধান চায়, তবে জানা থাকলেও তাকে তার সন্ধান দিবে না, বলবে তার সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

আরেক প্রকারের মিথ্যা জায়েয, কিন্তু সেটি একান্ত ঠেকায় পড়ে বাধ্য হলে। একান্ত প্রয়োজন না হলে এরূপ বলা জায়েয নেই। এক্ষেত্রে সত্যই বলা হয়, কিন্তু শ্রোতা অন্য কিছু বুঝে নেয়। আর বক্তার উদ্দেশ্যও থাকে অন্য কিছু বুঝানো। বলা হয় এক কথা, বুঝানো হয় অন্য কিছু। দুটি উদাহরণ দেয়া যাক-

একবার হযরত মুআয রদিয়াল্লহু আনহু যাকাত তহ্সীলের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরলে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহুর অধীন তহ্সীলদারীর কাজ করে এত যাকাতের টাকা আমদানী করে আসলেন, আমার জন্য কী এনেছেন?" হযরত মুআয রদিয়াল্লহু আনহু জবাব দিলেন, "আমার সাথে একজন প্রহরী ছিল, কাজেই কিছু আনতে পারিনি।" 'প্রহরী' বলতে তিনি সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলাকে উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বুঝেছিলেন, হয়ত সত্যি সত্যি খলীফা উমর রদিয়াল্লহু আনহু হযরত মুআয রদিয়াল্লহু আনহুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করেছেন।

হযরত শাবী রাহিমাহুল্লাহ অত্যাচারী শাসকদের হাত হতে বাঁচতে তাঁর দাসীকে বলে দিয়েছিলেন, কেউ আমাকে ডাকলে, দরজার মাঝে একটি বৃত্ত একে তার মধ্যে আঙুল রেখে বলে দিবে যে, তিনি এখন এখানে নেই, অথবা বলে দিবে, মসজিদে খোঁজ করুন।.....

মনে রাখবে, এরকম গোলমেলে বাক্য তখনই জায়েয হবে, যখন সরাসরি কিছু বললে বিপদে বা সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে, সত্যের সাথে যেন মিথ্যার মিশ্রণ না হয়।

জিহ্বার দশম আপদ: গীবত

কারো পশ্চাতে নিন্দা চর্চা করা কিংবা এমন কোনো ত্রুটি বর্ণনা করা, যে দোষ আসলেই তার মাঝে আছে, যা ঐ ব্যক্তির সামনে বললে সে কষ্ট পেত, এমন কথাকেই 'গীবত' বলে। আর যদি কারো পশ্চাতে মিথ্যা দোষ বর্ণনা করা হয়, যা তার মাঝে নেই, এটি আরো মারাত্মক গোনাহ, একে 'বুহতান' বা 'মিথ্যা অপবাদ' বলে।

গীবত করা বা গীবত শুনা উভয়টিই সমান অপরাধ।.......

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ

"তোমাদের মধ্যে কেউ অপরের গীবত করো না; তোমাদের কেউ কী তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ কর? অবশ্যই তোমরা এটাকে ঘৃণা কর।" (৪৯ সূরা হুযুরাত: ১২)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "পরনিন্দা হতে বেঁচে থাক। কেননা, 'গীবত' যিনা অপেক্ষা গুরুতর পাপ। যিনা করার পর অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দীলে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা হয়ত তাকে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু কারো গীবত করার পর সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত তওবা কবুল হবে না।"

প্রিয় নবীজী ﷺ আরো ইরশাদ করেন, মিরাজের রাতে একদল মানুষের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, তারা নিজেদের মুখমণ্ডলের গোশত নখ দ্বারা ছিঁড়ে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? উত্তর আসল, এরা পৃথিবীতে গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত।

হাদীস শরীফে এসেছে, কবরে যে দুটি গোনাহের জন্য সবচেয়ে বেশি আযাব হবে সেগুলো হলো- এক. গীবত তথা পরনিন্দা করা, দুই. নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্রাব করার সময় ছিটা থেকে রক্ষা না করা।

➢ কত ভাবে যে গীবত হয়........!!!

যে গুনাহ যিনার চেয়েও মারাত্মক, তাহলে বুঝতেই পারছো, গীবত কতটা ভয়ংকর! কিন্তু আমরা অধিকাংশ মুসলমানই জানি না কোন্ কথাটি আসলে গীবত, আর কোন্টা গীবত না। তাই মনোযোগ দিয়ে বুঝে নাও-

মনে কর, তুমি কারো শরীর, বংশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পশু, ঘর-বাড়ি, কার্যকলাপ, কথাবার্তা, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাল-চলন ইত্যাদি সম্পর্কে এমন কোনো কথা বললে বা আকারে ইঙ্গিতে বা ইশারায় বুঝিয়ে দিলে কিংবা কাগজে-কলমে লিখলে যা ঐ ব্যক্তির দোষ ইঙ্গিত করে, তা-ই গীবত।

শরীর সম্পর্কে গীবত এই যে, তুমি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বললে, লোকটি ঢেঙ্গা, বেটে (পুইট্টা), কাল, পীতবর্ণ, চোখটা জানি কেমন, কিংবা টেরা চোখ, নাক বোচা ইত্যাদি, এগুলো যদিও সত্য তবুও গীবত।।

মনে কর, এক ব্যক্তি খাটো, আর তুমি তা বুঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলে, টেরা বুঝানোর জন্য মুখে কিছু না বলে চোখ ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলে, কিভাবে হাঁটে তা হেঁটে দেখালে, একব্যক্তি কথা কম বলে বা গম্ভীর থাকে আর বুঝানোর জন্য তুমি মুখ ফুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে, তাও গীবত হবে।

আবার মনে কর, তুমি কারো নাম বললে না, শুধু বললে, কোনো একজন খোঁড়া লোক এভাবে হাঁটে। আর যাকে বললে, সে যদি না বুঝে

তাহলে তা গীবত হবে না, কিন্তু সে যদি বুঝে ফেলে তুমি কার কথা বলতে চাচ্ছ, তাহলেই তা গীবত হয়ে যাবে। এভাবে কাগজে কলমেও যদি কিছু লিখ, আর তা কারো দোষ বুঝায়, আর কেউ বুঝে ফেলে এটি কার সম্পর্কে লিখা হলো, তাহলে তাও গীবত।

বংশ সম্পর্কে গীবত এই যে, কাউকে বললে, লোকটি হারামীর বাচ্চা, রোহিঙ্গা, জোলার পুত ইত্যাদি।

চরিত্র সম্পর্কে গীবত এই যে, কাউকে বললে, লোকটি অশ্লীলভাষী, অহংকারী, রিয়াকার, দেখানো ইবাদত করে, চোর, বিশ্বাসঘাতক, বেশি কথা বলে, খালি প্যান প্যান করে, ভীরু, কাপুরুষ, অলস, ফাউল, আবুল, বেশি খায়, খালি ঘুমায়, পরিষ্কার কাপড় পরে না, টুপি ময়লা থাকে ইত্যাদি, এগুলো যদিও সত্য তবুও গীবত।

ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে গীবত এই যে, তুমি বললে, অমুক বে-নামাযী, রুকু সিজদা ঠিকমত করে না, কুরআন ভুল পড়ে, কাপড় পাক রাখে না, যাকাত দেয় না, হারাম খায়, সুদ খায়, ঘোষ খায়, জিহ্বাকে সংযত রাখে না, নিজের মর্যাদা অনুযায়ী চলে না, এগুলো যদিও সত্য তবুও গীবত।

➤ সাধু বেশে গীবত.........!!! হা হা হা!!!

দ্বীনদার-পরহেযগার লোকেরা কিভাবে গীবত করে তা কি তুমি জান?

মনে কর, তোমার সামনে কেউ অন্য একজনের দোষ বর্ণনা করল, আর সাথে সাথে তুমি বললে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে এসব দোষ থেকে পাক রেখেছেন।" কিংবা বললে,

সুবাহানাল্লাহ! বলো কী! এটা তো বড়ই আশ্চর্যের কথা! সেও এ ধরণের কাজ করে?" কিংবা বললে, "অমুকের এমন দুরবস্থা শুনে খুবই দুঃখিত হলাম, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন।" এগুলো সব নেক সুরতে গীবত। কেননা, তুমি বুঝালে, লোকটি যা করছে তা আসলেই খুব খারাপ, আর তোমার সাথে যে নিন্দা চর্চা করলো, তাকে তুমি সমর্থন দিলে।

আবার কারো সম্পর্কে বললে, "লোকটি অনেক পরহেযগার, কিন্তু তার মধ্যেও কয়েকটি সমস্যা আছে (কিংবা বললে এই... এই...সমস্যা আছে)। আমরা দোআ করি, আল্লাহ যেন তাকে তার সব দোষ-ত্রুটিগুলো থেকে পাক করে দেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।" হা হা হা!!! এটি সাধু বেশে এক ভয়ংকর গীবত!!!

এটি একই সাথে মুনাফেকী এবং গীবত। কেননা, অন্তরে গীবতের প্রতি ঘৃণা নেই, দীলের মাঝে গীবত করার ইচ্ছা, কিন্তু মুখে সাধু বেশে অন্যের দোষচর্চা করা হচ্ছে। মানুষকে নেক সুরতে ধোকা দেয়া হচ্ছে।

কেউ যদি তোমার সামনে অন্য কারো দোষ চর্চা করে,তাহলে তাকে আকারে ইঙ্গিতেও যদি বুঝিয়ে দাও, ভাই গীবত করবেন না, তাতেও তোমার দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় হবে না। এক্ষেত্রে তোমাকে যা করতে হবে তা হলো- এক. অন্তর থেকে গীবতকে ঘৃণা করতে হবে, দুই. স্পষ্ট ভাষায় গীবত করতে নিষেধ করতে হবে।

আরো মনে রেখো, মুখে পরনিন্দা বা গীবত যেমন হারাম, মনে মনে নিন্দা কল্পনা করাও তদ্রূপ হারাম। নিজের চোখে না দেখে, নিজের কানে না শুনে, দুই জন বালেগ পুরুষের সাক্ষী ছাড়া কেবল পরের কথায় কারো প্রতি নিশ্চিতরূপে মন্দ ধারণা পোষণ করা আন্তরিক গীবত। এটিও হারাম।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا۟

"ওহে মুমিনগণ! তোমরা অনেক (কু-) ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা অধিকাংশ (কু-) ধারণাই গুনাহ। আর তোমরা একে অন্যের দোষ তালাশ করো না।" (৪৯ সূরা হুযুরাতঃ ১২)

এ থেকে বাঁচার উপায় হলো- কারো সম্পর্কে খারাপ চিন্তা আসলে, এই চিন্তা আসাকেই ঘৃণা করবে। এই চিন্তা মানুষের অন্তরে শয়তান ঢেলে দেয়। তাই অন্তরে এই চিন্তাকে লালন করবে না। যার সম্পর্কে খারাপ ধারণা আসছে, তার সাথে পূর্বের চেয়ে আরো ভালো ব্যবহার করবে, তার প্রতি আরো আন্তরিকতা দেখাবে।

➢ যেখানে যেখানে গীবত জায়েযঃ.........

প্রথম ওযরঃ বিচার প্রার্থনা এবং সাহায্যের আবেদন জানাতে। যদি কোনো দেশের রাজা বা বিচারপতির কাছে কারো দোষ বর্ণনা করে তার যুলুম থেকে রেহাই পেতে আবেদন করা হয়, তাতে গুনাহ হবে না।

দ্বিতীয় ওযরঃ মনে কর, তুমি দেখলে কোথাও কোনো ঝগড়া-বিবাদ কিংবা খারাপ কোনো কাজ হচ্ছে, আর তোমার এও জানা আছে যে, অমুক ব্যক্তি এই সব অন্যায় ও খারাপ কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তার কাছে সে সব লোকের দোষ বর্ণনা করা জায়েয।

তৃতীয় ওযরঃ ফত্ওয়া অর্থাৎ শরীয়তের বিধান জানতে চাওয়া। যদি কোনো মুফতী সাহেবের কাছে এরূপ বলা হয়, "আমার পিতা, স্বামী বা

অমুক আমার সাথে এমন ব্যবহার করে, শরীয়ত মতে আমার এখন করণীয় কী?”- তাহলে তা জায়েয।

চতুর্থ ওযর: যদি কোনো ফাসেক বা গুনাহগার ব্যক্তির কার্যকলাপ এমন হয় যে, তার দ্বারা উম্মতের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করতে তার দোষ-ক্রুটি উম্মতের সামনে তুলে ধরতে হবে। মনে কর, কোনো লোক বিদআতী, কিংবা গাদ্দার যে উম্মতের ক্ষতি করতে উপায় খুঁজছে, কিংবা কোনো চোর যে চুরি করার সুযোগ খুঁজছে, এমতাবস্থায় এদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করা তোমার ঈমানী দায়িত্ব।

বুযুর্গগণ বলেন, তিন প্রকারের লোকের দুর্নাম করলে গীবত হয় না,

(১) অত্যাচারী/যালেম শাসক বা বাদশাহ,

(২) বেদআতী অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী নূতন প্রথা ও কার্যকলাপ শরীয়তের নামে প্রচলনকারী এবং

(৩) প্রকাশ্য পাপে লিপ্ত দুরাচার ফাসেক ব্যক্তি, যেমন: প্রকাশ্যে কুকর্ম বা ব্যভিচার করে, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও প্রেম করে বেড়ায়, প্রকাশ্যে মদ পান করে ইত্যাদি। এদের দোষ এজন্য প্রকাশ করা জায়েয, কারণ, এরা নিজেরাই নিজেদের দোষ গোপন রাখে না। অপর কেউ তাদের দোষের কথা বললেও এরা মনঃক্ষুণ্ন হয় না।

পঞ্চম ওযর: যারা দোষযুক্ত নামেই সবার কাছে পরিচিত এবং ঐ নামে ডাকলে তারা দুঃখিত হয় না।

➤ তাহলে, গীবতের কাফ্ফারা কী হবে?..........

সেকথাই এখন বলবো, ইন্শাআল্লাহ। তার আগে মনে রেখো, জীবনে তুমি যাদের যাদের গীবত করেছো, হাশরের ময়দানে তারা সকলে তোমার আমলনামা থেকে নেকী নিয়ে যাবে। এভাবে নিতে নিতে যদি দেখা যায় যে, তোমার আমলনামায় আর কোনো নেকী বাকী নেই, তখন তাদের গুনাহের ভার তোমার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তখন অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, গুনাহ করেছে তারা আর শাস্তি ভোগ করছ তুমি.....!!! হা হা হা!!! আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

একবার কেউ হযরত হাসান বছরী রাহিমাহুল্লাহর গীবত করলে তিনি এক ডালি ফল-মূল আর অনেক হাদিয়া নিয়ে সেই গীবতকারীর বাড়ি এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভাই, শুনলাম, তুমি নাকি তোমার আমলনামার নেকী সমূহ আমার আমলনামায় পাঠিয়ে দিয়েছ? কিভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করব!!! তুমি আমার আখিরাতের যিন্দেগীর জন্য এত বড় উপকার করলে, তাই আমার সাধ্যের মধ্যে অল্প কিছু হাদিয়া তোমার জন্য নিয়ে এলাম। পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারলাম না, এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে মাফ করে দাও।..........

যাই হোক, কখনো কারো গীবত হয়ে গেলে নিম্নের কাজগুলো করবে-

১. নিতান্ত অনুতাপের সাথে তাওবা করবে এবং এ কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার সামনে লজ্জিত হবে। ভবিষ্যতে এরূপ না করার সংকল্প করবে।

২. যে ব্যক্তির নিন্দা করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাবে, এবং বলবে- ভাই/বোন, আমি তো আপনার নামে অনেক দোষ চর্চা করেছি, এই..... এই.... বলেছি, দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি অনুতপ্ত, জীবনে আর কখনো এমনটি হবে না। (এভাবে ক্ষমা চাইতে থাক, তার প্রশংসা কর, তাকে হাদিয়া দাও, তার জন্য দোআ কর। মুখে বলতে না পারলে অতি বিনয়ের সাথে তার বরাবর চিঠি লিখে ক্ষমা চাও। তবে তুমি কী কী বলেছো, তা অবশ্যই উল্লেখ করবে, নাহলে সে কী জন্য তোমাকে ক্ষমা করবে? এভাবে চেষ্টা করলে আশা করা যায়, সে মাফ করে দিবে। আর যদি সে মাফ নাও করে, তবে তুমি যে অনুতপ্ত হয়েছো এবং তার কাছে ক্ষমা পাওয়ার চেষ্টা করেছো, তা তো আল্লাহ তাআলা জানেন, তিনি হয়তো হাশরের ময়দানে তোমার নাজাতের কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন।)

৩. যার গীবত করা হয়েছে, তাকে যদি আর না পাওয়া যায়, অথবা সে মৃত্যুবরণ করে থাকে, তবে তার মাগফিরাতের জন্য বেশি বেশি দোআ করতে থাক। কেননা সে যদি হাশরের ময়দানে মাফ পেয়ে যায়, তাহলে সে তোমার নেকীর দিকে তাকাবে না। এছাড়া তার জন্য সদকা করে সওয়াব রেছানী কর। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা নাজাতের ব্যবস্থা করে দিবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 'যিনার চেয়ে নিকৃষ্ট' এ ভয়াবহ ব্যাধি 'গীবত' থেকে বাঁচান। আমীন।

জিহ্বার একাদশ আপদ: কূটনামী করা এবং কথা লাগান

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ

"যারা বিদ্রূপ করে, কানে কানে কথা লাগিয়ে বেড়ায় (তাদের কথা বিশ্বাস করো না)। (৬৮ সূরা কলম: ১১)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ

"প্রত্যেক কূটনা লোকের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।" (১০৪ সূরা হুমাযাহ: ০১)

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ

"জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারিণী, কানকথা লাগিয়ে বিবাদ সৃষ্টিকারিণী (খুব শীঘ্রই দোযখে প্রবেশ করবে)। (১১১ সূরা লাহাব: ০৪)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "চোগলখোর ব্যক্তি অর্থাৎ যারা একের কথা অন্যের কানে লাগিয়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে, তারা বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাবে না।"

মনে রেখ, একজনের কথাকে বিকৃত করে অপ্রিয় আকারে অপরের কানে লাগালেই যে কেবল কূটনামী হবে তা নয়, বরং একজনের কার্যকলাপকে মুখে, ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা লেখনীর মাধ্যমে অন্যের নিকট বিকৃতাবস্থায় অপ্রিয় আকারে প্রকাশ করলেও তাকে কূটনামী বলে।

যদি কেউ তোমার নিকট এসে বলে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার নামে এই এই কথা বলেছে, এই লোকই চোগলখোর, এর কথা বিশ্বাস করো না, হোক সে যত বড় আবেদ কিংবা বিশ্বস্ত লোক। এইরকম পরিস্থিতির শিকার হলে তোমার ছয়টি করণীয় আছে, যথা:

১. উক্ত সংবাদ দাতার কথা আদৌ বিশ্বাস করো না। কেননা, যারা একজনের কথা অন্যের কাছে লাগায়, এরা কূটনা, ঠগবাজ, মিথ্যাবাদী, ফাসেক। আর আল্লাহ বলেন, "ফাসেক লোকের কথায় বিশ্বাস করো না।"

২. উক্ত সংবাদ দাতাকে বুঝিয়ে দিবে, ভাই, এভাবে একজনের কথা অন্যের কাছে লাগানো মহাপাপ। এভাবে বুঝানো তোমার উপর ওয়াজিব।

৩. এরূপ কূটনা ব্যক্তিদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে এবং সেই ঘৃণা ব্যক্তিগত স্বার্থে না হয়ে কেবল আল্লাহর জন্য হতে হবে। চোগলখোর ব্যক্তির সাথে আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা ওয়াজিব।

৪. এই ব্যক্তির সংবাদ অনুযায়ী কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। কেননা, কারো প্রতি নিশ্চিত না হয়ে অন্তরে মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম।

৫. এই সংবাদ সত্য নাকি মিথ্যা, এই ব্যাপারে কোনোরূপ অনুসন্ধান করো না। কেননা, আল্লাহ পাক কঠোরভাবে অন্যের দোষ তালাশ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন: وَلَا تَجَسَّسُوا "আর তোমরা অন্যের দোষ তালাশ করো না।" (৪৯ সূরা হুযুরাত: ১২)

৬. যা নিজে পছন্দ কর না, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করো না। অর্থাৎ এই সংবাদ সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখবে, অন্যের নিকট প্রকাশ করো না, নিজেই চোগলখোর হয়ে যেও না।

মনে রেখ, চোগলখুরীমূলক কোনো কথা শুনলে, উপরোক্ত ছয়টি কাজ করা তোমার উপর ওয়াজিব। বাস্তবতা হচ্ছে এই, সত্য কথা পৃথিবীর সকলের কাছে পছন্দনীয় হলেও, কেবল চোগলখোরের সত্য কথাও অপছন্দ করা চাই, এতেই অধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই নিজেও কখনো চোগলখুরী করবে না, অন্যের কূটনামীকেও বিশ্বাস করবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তুমি নিশ্চিত জান যে, কোনো ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করছে বা করার চেষ্টায় লিপ্ত আছে, তবে তা গোপন না রেখে ঐ ভাইকে জানিয়ে দিবে। একইভাবে, যদি কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পার, যাতে উম্মতের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে তাও উম্মতের কাছে গোপন রাখবে না।

একবার খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহর সামনে এক ব্যক্তি অন্য একজন লোক সম্পর্কে চোগলখুরী করে বলল, অমুকে আপনার সম্পর্কে এই....এই.... বলেছে। উত্তরে খলীফা বললেন, "তুমি যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে তুমি ফাসেক। আর ফাসেক লোক সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ

"হে মুমিনগণ! ফাসেক লোক তোমাদের নিকট যদি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা বিশ্বাস করো না।" (৪৯ সূরা হুযুরাত: ০৬)

আর তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তুমি চোগলখোর। আর চোগলখোর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ

"যারা বিদ্রূপ করে, কানে কানে কথা লাগিয়ে বেড়ায় (তাদের কথা বিশ্বাস করো না)। (৬৮ সূরা কলম: ১১)

অতএব, হে সংবাদ প্রদানকারী! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এই চোগলখুরীরূপ মহাপাপ হতে তওবা করে নাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো।" লোকটি বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তওবা করছি।"

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক নামক উমাইয়া বংশীয় একজন খলীফা জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমার নামে এমন এমন দুর্নাম করেছো? লোকটি উত্তর দিল, না। খলীফা বললেন, 'একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোক আমার নিকট এই সংবাদ দিয়েছে।' হযরত ইমাম যোহরী রাহিমাহুল্লাহ সেখানে বসা ছিলেন। তিনি সাথে সাথে উঠে গিয়ে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! চোগলখোর ব্যক্তি কখনো সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হতে পারে না।" খলীফা বললেন, "আপনি যথার্থ বলেছেন।" এবং লোকটিকে বললেন, "তুমি নিরাপদে ঘরে ফিরে যাও।"

জিহ্বার দ্বাদশ আপদ: দুমুখো নীতি

বিবাদমান দুই পক্ষের উভয়ের নিকট গিয়ে তাদের প্রত্যেকের মনমত কথা বলে উভয়ের নিকট মিত্র হওয়ার ভান করা- এটাই দুমুখো নীতি। এটি চোগলখুরী অপেক্ষাও জঘন্য পাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "দুমুখো লোক আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

মনে রেখ, যদি মুসলমানদের বিবাদমান উভয় পক্ষের সাথে তোমার সুসম্পর্ক থাকে, তাহলে তোমাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

১. কোনো পক্ষ থেকে কোনো কথা শুনলে একদম নীরব থাকবে।
২. আর একান্ত যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে হক কথা বলবে।
৩. একজনের কথা কখনো অন্যের নিকট বলবে না।
৪. কারো কাছে গিয়ে বলবে না যে, আমি তোমার বন্ধু।
৫. সম্ভব হলে, বিবাদ মীমাংসা করার চেষ্টা করবে, যদি এক পক্ষের ব্যাপারে অন্য পক্ষের কাছে (মিথ্যা হলেও) বলবে যে, তারা তোমাদের খুব প্রশংসা করে, তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে, আর বিবাদ চায় না। ইত্যাদি।

আরেকটি বিষয় মনে রেখ, 'দুমুখো নীতি' জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি যুদ্ধ কৌশল। এর দ্বারা শত্রু শিবিরে কাফেরদের মিত্র দলগুলোর মাঝে ফাটল বা চির ধরানো যায়। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "যুদ্ধ মানেই ধোকাবাজি (ও কৌশল)।" খন্দকের যুদ্ধে হযরত নাঈম ইবনে মাস'উদ রদিয়াল্লহু আনহু বনু কুরাইযার ইহুদী গোত্র

এবং কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে ফাটল ধরাতে "দু'মুখো নীতি" অবলম্বন করেছিলেন।

֍ জিহ্বার ত্রয়োদশ আপদ: কারো প্রশংসা করা এবং প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা

কোনো মানুষের সামনে তার প্রশংসা করবে না, প্রশংসা করতে হলে তার আড়ালে প্রশংসা করবে। এক ব্যক্তি নবীজী ﷺ এর সামনে অপর কোনো একজনের প্রশংসা করলো। নবীজী ﷺ বললেন, "আফসোস! লোকটিকে তুমি হত্যা করলে। যদি কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে এভাবে বলবে, আমি লোকটিকে এমন জানি, তবে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে দোষী না নির্দোষ তা আমি বলতে পারি না।"

কিভাবে লোকটিকে হত্যা করা হলো?

প্রশংসিত ব্যক্তি দুই প্রকারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যথা:

(১) নিজের প্রশংসা শুনলে মানুষের মনে অহঙ্কার ও আত্মাভিমান সৃষ্টি হয়। ফলে সে নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করে এবং অন্যদেরকে ছোট মনে করতে শুরু করে। আর হাদীসে এসেছে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার আছে, সে জাহান্নামী। অর্থাৎ এই প্রশংসার কারণে লোকটি ধ্বংস হয়ে গেল।

(২) মানুষ যার প্রশংসা করে সে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করতে শুরু করে। ফলে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে অলস হয়ে যায়। এভাবে তার দ্বীনী কিংবা দুনিয়াবী উন্নতির সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

মনে রেখ, যদি এরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে প্রশংসা করতে সমস্যা নেই।

যেমন: আল্লাহর রাসূল ﷺ সামনা সামনি সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। কেননা তিনি জানতেন, 'প্রশংসা' সাহাবায়ে কেরামের কোনোই ক্ষতি করবে না। এতে উনার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সকল প্রশংসিত সাহাবীদেরকে যেন উম্মত সম্মান করতে শিখে।

যদি কেউ তোমার প্রশংসা করে, তাহলে চিন্তা কর, তোমার শেষ পরিণতি কি তুমি জান? যদি তুমি জান্নাতে না গিয়ে জাহান্নামে যাও, তাহলে একজন জাহান্নামীর তুলনায় তো কুকুর-শিয়াল কিংবা শূকর অনেক ভালো। আর কেউ কি বলতে পারে, আমি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেছি। তাহলে কেউ প্রশংসা করলে তাতে আনন্দিত হওয়ার কী আছে?

আরো চিন্তা কর, এই লোকটি এইজন্যই তোমার প্রশংসা করল, কারণ সে তোমার ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। আজকের দিনটির কথাই চিন্তা কর। আজ সারাদিন তুমি কত গুনাহের চিন্তা করেছ, হয়ত অনেক গুনাহ হয়েও গেছে। আর গুনাহযুক্ত কিংবা গুনাহের চিন্তাযুক্ত অন্তরের অবস্থা তো প্রস্রাব-পায়খানার চেয়েও নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত। এই প্রশংসাকারী যদি এমন অন্তরের ঘ্রাণ লাভ করতে পারতো, তাহলে সে তোমার থেকে দৌঁড়ে পালাতো। আর আজ সারাদিন ইবাদত যা করেছো, তা কি আল্লাহর শান অনুযায়ী কিংবা সাহাবায়ে কেরামের মতো হয়েছে? সর্বদা কি আল্লাহ তাআলার স্মরণ তোমার অন্তরে বিদ্যমান ছিলো? ছিলো না। তাহলে কারো প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার কী আছে?

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুকে কেউ প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "ইয়া আল্লাহ! এরা আমার সম্পর্কে যা কিছু বলছে, তার জন্য তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও (কেননা তারা তো আমার ভিতরের অবস্থা না জেনেই আমার প্রশংসা করেছে)। আর এরা আমাকে যেরূপ মনে করে, তুমি আমাকে তার চেয়েও উত্তম বানিয়ে দাও।"

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে ভিতরের অবস্থাকে অনেক ভালো করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের বাহ্যিক অবস্থাকে অনেক ভালো করে দাও। আমীন।

পেটের হেফাযত:

হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে তোমার পেটকে হেফাযত কর। হালাল উপার্জনে ব্রতী হও। আর হালাল খাদ্যও প্রয়োজনের তুলনায় কম খাও। দিনে এক বেলার বেশি খেয়ো না। কেননা এর বেশি খাওয়া অপচয় ও এটি বিদআত। পেট ভরে খেলে কূলব শক্ত হয়ে যায়, বুদ্ধিমত্তা খর্ব হয়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়, ইবাদত ও ইলম হাছিলের ক্ষেত্রে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, অলসতা পয়দা হয়, মানসিক (রূহানী) ও শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা ও নফছের কামনা প্রবল হয় এবং শয়তানের প্রতারণা ও কুমন্ত্রণায় সহযোগী হয়। অতিরিক্ত হালাল খাদ্য দ্বারা পাকস্থলিতে যে পরিপূর্ণতা আসে, তা-ই সকল পাপের উৎস। তাহলে হারাম কিংবা সন্দেহযুক্ত খাদ্যের দ্বারা অর্জিত তৃপ্তির পরিণাম আরো কত মারাত্মক, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ জন্যই হালাল রুজী

অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। বস্তুতঃ হারাম কিংবা সন্দেহযুক্ত খাদ্য খেয়ে ইবাদত বন্দেগী করা গোবরের উপর ইমারত তৈরী করার নামান্তর। যদি তুমি মোটা কাপড়ের একটা বা সর্বোচ্চ দুটা জামা এবং চব্বিশ ঘন্টায় একবেলা আহারের উপর তুষ্ট হতে পার এবং সুস্বাদু খাবারের লোভ পরিত্যাগ করতে পার, তাহলে কোনো দিনই তোমার জন্য হালাল খাদ্যের অভাব হবে না। আর হালাল রুজী অল্প হলেও অনেক।

কোন্ খাদ্য হারাম? এক হলো খাদ্য নিজেই হারাম, যেমনঃ মদ, শূকর। আর দুই হলো খাদ্য যে সম্পদ দ্বারা অর্জন করা হয়েছে, তা হারাম। সে সব মানুষের উপার্জন হারাম তাদের প্রদত্ত খাবার খাবে না, তাদের মেহমানদারী কবুল করবে না। এখন যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত, কিংবা কারো অধিকাংশ মাল হারাম হওয়া সম্পর্কে তুমি যদি নিশ্চিত হও, তাহলে সেগুলো তো বর্জন করবেই, যেগুলো আলামতের দ্বারা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয় (হারাম উপার্জনকারীদের সন্দেহযুক্ত খাবার), সেগুলোও পরিহার করবে। হারাম উপার্জনকারীদের সন্দেহযুক্ত খাবারের উদাহরণ হচ্ছে- সরকার এবং সরকারী আমলাদের কোনো সম্পদ, ঘোষখোরী, রাজনৈতিক নেতাদের সম্পদ, মদের ব্যবসা, সুদের ব্যবসা, ব্যাংকের চাকুরী, বাদ্যযন্ত্রের কিংবা হারাম খেলাধুলার সরঞ্জামাদি বিক্রয় ইত্যাদি (এ সম্পর্কে "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীঃ গরীব ইসলাম" দ্বিতীয় খণ্ডে 'পেশা' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে); বর্তমান যামানায় খুব কম ব্যবসায়ী পাওয়া যাবে, যে সুদের লেনদেন করে না; নিজে হয়তো সুদ খায় না, কিন্তু ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করে থাকে। যে ব্যবসা করার সামর্থ্য তোমার নেই, সে ব্যবসার জন্য ঋণ করা লোভ, তার উপর সুদী ঋণ গ্রহণ করা মহাপাপ

(গুনাহে কবীরা)। তাই এ ধরণের ব্যবসায়ীদের আতিথেয়তা কবুল করবে না। খাওয়ার আগে অবশ্যই তাহকীক (যাচাই) করবে-হালাল, সন্দেহযুক্ত নাকি হারাম। নিজে তো এসব করবেই না, যারা এগুলো করে তাদের থেকে পলায়ন করবে, তাদের কোনো খাবার তোমার পেটে যেন না যায়।

নিশ্চিত হারাম বস্তুসমূহের মাঝে আরেকটি হচ্ছে- ঐসব সম্পদ যেগুলো ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তির শর্ত ও ইচ্ছার বিপরীতে অন্যতর কাজে ভোগ করা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা করছে না, সে কোনো মাদরাসার শিক্ষক/উস্তাদ কিংবা খাদেম, এখন সে যদি মাদরাসার গোরাবা ফান্ড কিংবা ওয়াক্‌ফকৃত তহবীল যা গরীব ছাত্রদের জন্য গঠন করা হয়েছে, তা থেকে ভোগ করে, তা হারাম। বর্তমানে অধিকাংশ মাদরাসার অবস্থা হচ্ছে এই, গোরাবা ফান্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই। ফলে কে বা কারা গোরাবা ফান্ড থেকে ভক্ষণ করছে, আর মাদরাসার শিক্ষক/উস্তাদ/স্টাফরা কোথা থেকে খাচ্ছে, এগুলোর কোনো হিসাব বা খোঁজ-খবর নেয়া হয় না। এসব জগাখিঁচুড়ি আর হারাম মাল খেয়ে ইলম হাছিল করলে দ্বীন ইসলাম কিংবা উম্মতের কী ফায়দা হবে? এসব লোকদের অন্তরে ইলমের নূর আর হিদায়াতের নূর কিভাবে আসবে? এরা তখন কেন হকপন্থী আলেম আর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কথা বলবে না? তিনবেলা পেট ভরে হারাম খেলে খাহেশাত আর ফাহেশাত (লেওয়াতাত) কেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না?

তাই আমরা সকলেই সতর্ক হই। হারাম আর সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়া থেকে সর্বোচ্চ পরহেয করে চলি। একটি ঘটনা বলে এ বিষয়ের ইতি টানছি-

হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর একজন গোলাম ছিল। সে অন্যের কাজ করত। হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে আসত। খাওয়ার পূর্বে তিনি খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন- এ খাবার তুমি কোথা থেকে এনেছ?

একদিন গোলাম খাবার নিয়ে এল। হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুকে দিলো। তিনি পাঁচ-ছয়দিন পর পর খানা খেতেন। ক্ষুধার আতিশয্যের দরুন তিনি খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন এবং এভাবেই বেশ কয়েক লোকমা খেয়ে ফেললেন।

গোলাম আশ্চর্য হয়ে বলল- আপনি তো সব সময় খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে খান!

খাওয়া বন্ধ করে হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু গোলামের দিকে তাকালেন। বললেন- আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। এখন বল, কোথা থেকে এনেছ?

গোলাম বলল- জাহেলিয়্যাতের যুগে আমি এক লোকের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে জানি না। তাকে ধোকাই দিয়েছিলাম এক প্রকার। আজ সে আমাকে দেখে এ খাবার দিয়ে বলল- তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে।

হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন- তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছো। তিনি গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন, বমি করলেন। সব খাবার বেরিয়ে গেল।

কেউ বলল- এ কয়েক লোকমার জন্য আপনি এত কিছু করলেন?

হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন- যদি এ খাবার আমার প্রাণের বিনিময়েও বের হতো তা হলে আমি তা-ই করতাম।.......

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

যৌনেন্দ্রিয়ের হেফাযত:

'কামভাব' আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি। এর দ্বারা মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। তাছাড়া জান্নাতের অসীম নিয়ামতের মধ্যে এটিও একটি, যার দ্বারা এই নশ্বর পৃথিবীতে জান্নাতের অসীম নেয়ামতের কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু একে যদি আল্লাহর বিধানের বাহিরে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা মহা ধ্বংসের কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা যেসব ক্ষেত্রে যৌনেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, সেসব ক্ষেত্র থেকে যৌনেন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। আর আল্লাহ তাআলার ঘোষিত এসব পূণ্যবান লোকের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার চেষ্টা কর:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"(সফলকাম তারা) যারা তাদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তবে নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে-এটি নিন্দনীয় নয়।"

(২৩ মু'মিনীন: ৫,৬)

যৌনেন্দ্রিয়কে হেফাযত করতে হলে তোমার চোখকে কামদৃষ্টি থেকে এবং অন্তঃকরণকে অসৎ চিন্তা থেকে সংযত করতে হবে। কোনো সুন্দরী নারী কিংবা সুন্দর চেহারার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে চোখ ফিরিয়ে নেয়া সহজ। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি স্বাধীনভাবে চোখকে ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে আয়ত্তে আনা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই চোখকে নিয়ন্ত্রণ করাই 'প্রেম' নামক ভয়াবহ ফিতনা থেকে বাঁচার আসল উপায়।

অনুরূপ, তোমার পাকস্থলীকেও সন্দেহজনক খাদ্য এবং পরিতৃপ্ত ভোজন থেকে হিফাজত করতে হবে। দিনে এক বেলার বেশি, পেট ভরে খাবে না। কারণ, এগুলোই হচ্ছে কামপ্রবণতার উৎস এবং উত্তেজনা সৃষ্টির মূল কারণ। যে ব্যক্তি চোখকে সংযত রাখতে সক্ষম না হয়, তার জন্য অবিলম্বে সাধনা ও পরিশ্রমের সাহায্যে কামরিপুকে দমানো ওয়াজিব। রোযা রাখা বা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা কামরিপুকে দমানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। রোযা রেখেও যদি কামভাব প্রশমিত না হয় তবে তার উপর বিবাহ করা ওয়াজিব।

প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "আমার তিরোধানের পর আমার উম্মতের জন্য নারী অপেক্ষা ভয়াবহ ফিতনা আর কিছুই থাকবে না।"

মনে রেখো, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রেম করার মতো যথেষ্ট সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, কোনো উচ্চ-বংশীয়া, সুন্দরী নারীর প্রেম-প্রস্তাব বা কাম-প্রস্তাব লাভ করার পরও, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি মহাপুণ্যের অধিকারী হবে, তাকে ঈমানের পরিপূর্ণ মিষ্টতা প্রদান করা হবে- যা সে আপন হৃদয়ে অনুভব করবে, আর

তাকে হাশরের ময়দানে সেই সাত শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা হবে যারা আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় স্থান পাবে, যেদিন সূর্য মাথার উপর এক বিঘত পরিমাণ উচ্চে থাকবে আর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। এছাড়াও তাকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের মর্যাদা দান করা হবে। কেননা, (মানসিক দৃঢ়তা ও চরিত্রবলে) কামরিপুকে জয় করার ক্ষেত্রে তিনিই জগতের আদর্শ এবং অগ্রনায়ক।

কামরিপুর ফেতনা থেকে বাঁচতে নিচের কাজগুলো করাও আবশ্যক।

১. নারী-পুরুষ উভয়েই খাছ শরয়ী পর্দা করবে। গায়রে মাহরামদের থেকে দূরে থাকবে। তাদের সাথে দেখা করবে না। কথা বলবে না। গায়রে মাহরাম সামনে পড়তে পারে, বা কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে এমন পরিবেশ থেকে দূরে থাকবে। একান্ত কোনো কথা বলার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে বলবে। নারী-পুরুষ উভয়ই কর্কশ ভাষায় কথা বলবে, যেন কণ্ঠে কোমলতা না থাকে, যার কারণে মনে ওস্ওয়াসা আসার সম্ভাবনা থাকে।

২. মেয়েরা পর্দার নামে প্রহসন করবে না। আপাদমস্তক ঢাকা থাকবে। চোখও খোলা রাখবে না। কেননা সারা দেহের মধ্যে আল্লাহ পাক চোখকেই সবচেয়ে আকর্ষনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। বোরকার নামে রঙ-বেরঙের, বাহারী স্টাইলের বোরকা পরিধান করবে না। কেননা এতে পুরুষ আরো বেশি আকৃষ্ট হবে। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত, মাহরাম ছাড়া বাহিরে বের হবে না। পুরাতন, কালো কাপড়ের, ইস্ত্রীবিহীন বোরকা পরিধান করবে। কোনোরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে বেরোবে না। যারা এমন করে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এদেরকে ব্যভিচারিনী আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং সাবধান!

৩. যারা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, বোনদেরকে বেপর্দা বাহিরে বের হতে দেয়, হাদীসের ভাষায় এরা হলো 'দাইয়ুস'। এসব 'দাইয়ুস' পুরুষদের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাত হারাম করেছেন।

৪. কখনো কোনো পরনারীর সাথে এক কক্ষে বা এক স্থানে একাকী অবস্থান করবে না, কেননা এই অবস্থায় শয়তান হয় তৃতীয় ব্যক্তি। সে তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করার ব্যাপারে ওস্‌ওয়াসা দিতে থাকে।

৫. কামরিপুকে দমন না করলে তা কামোন্মাদনায় রূপ নিবে, তখন যত সব বিকৃত যৌনাচার প্রকাশ পেতে থাকবে।

৬. পর্ণগ্রাফী, অশ্লীল মুভ্যি, ফেইসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদি, এসব টেকনোলজি থেকে দূরে থাকবে।

৭. পাশ্চাত্যের কুত্তা-কুত্তীদের স্টাইলে সহবাস করবে না। সুন্নত তরীকায় সহবাস করবে। এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনলাইনে মুফতী মুহাম্মাদ ইবনে আদম আল কাউসারী সাহেবের একটি কিতাব পাওয়া যায়। এই কিতাবটি সকল বিবাহিতদের জন্য অবশ্য পাঠ্য। গুগলে PDF Islamic Guide to Sexual Relations, by Muahammad Ibn Adam Al- Kawthari. লিখে সার্চ দিলেই কিতাবটি পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

৮. পুরুষদের জন্য কামভাব নিয়ে অন্য নারীদের পোশাকের দিকে তাকানো কিংবা ঘ্রাণ নেয়া হারাম। এতে নাকের যিনা হবে। পরনারী যেমন গার্লফ্রেন্ডকে হাত দিয়ে ধরা হাতের যিনা; তার দিকে আগানো পায়ের যিনা; তার সাথে কথা বলা মুখের যিনা; তার কথা শুনা কানের যিনা; ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সাথে মোবাইলে কথা বলা মুখ ও কানের যিনা; তাকে নিয়ে চিন্তা করা মনের যিনা; গোপনে মিলিত হওয়া গুপ্তাঙ্গের যিনা; এগুলো প্রত্যেকটিই গুনাহে কবীরা, আর একটি কবীরা গুনাহই জাহান্নামে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই দ্রুত তওবা করে ফিরে আস.....

৯. অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রেমিক-প্রেমিকাদের, ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী মহিলাদের দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে, যেটি ঠিক চুলার মতো উপরের দিক সরু আর নীচের দিক প্রশস্ত। আগুনের ঢেউয়ের সাথে লোকগুলো একবার উপরের দিকে উঠে গর্তের মুখে এসে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। আবার যখন আগুন নীচের দিকে যাবে সাথে সাথে মানুষগুলোও নীচে চলে যাবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এই সকল প্রেমিক-প্রেমিকাদের আগুনে ভাজা হবে।

֍ প্রেম করার মজা.........!!!!

প্রেম করে বিয়ে করায় কোনো লাভ নেই। কেননা, ৫০ বছর প্রেম করলেও ভিতরের মানুষটিকে চিনা যায় না। বিয়ের পর মানুষের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়।

প্রেম করে বিয়ে করলে যে যে সমস্যায় পড়তে হয়-

১. পরস্পরের মাঝে কখনো বিশ্বাস জন্মে না।

২. একজন আরেকজনের চরিত্রের ব্যাপারে কখনোই আস্থাবান হতে পারে না। অন্য কারো সাথে একজন একটু কথা বললেই আরেকজনের মনে হয়- সে কেন হাসি মুখে ওর সাথে কথা বলছে?
তাহলে কি..........???

৩. বিয়ের পর কেবলই সন্দেহের বীজ দানা বাধতে থাকে। কেবলই মনে হয়- সত্যিই কি সে আমাকে ভালবাসে? সে অন্য কাউকে ভালোবাসে না তো?

৪. বিয়ের আগে পারস্পরিক সম্পর্কের লেখচিত্র থাকে উর্ধ্বমুখী (সংশ্লেষণ), আর বিয়ের পর হয়ে যায় নিম্নমুখী (বিশ্লেষণ)।

৫. বিয়ের পর পুরুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে স্ত্রীর উপর আধিপত্য। আল্লাহ পাক স্বামীকে সংসার চালানোর জন্য 'আমীর' নির্ধারণ করেছেন, আর স্ত্রীকে বানিয়েছে 'মামুর'। তাই আমীর সাবের আধিপত্য চলবে মামুরের উপর- এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজের উপরে স্বামীর আধিপত্য মেনে না নেয়, তাহলে সে সংসার হয় জাহান্নামের কোনো একটি সঙ্কীর্ণ গর্ত। প্রেম করে বিয়ে করলে এই আধিপত্য থাকে না। অনেক

ক্ষেত্রে এর উল্টোটা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করে। যার কারণে সাংসারিক কলহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

৬. বলুন তো ভালোবাসা কত প্রকার?..........

জানি, বলতে পারবেন না। তাহলে শুনুন, ভালোবাসা তিন প্রকার। যথা:

(১) সাধারণ ভালোবাসা, যা সমানে-সমানে হয়, যেমনঃ বন্ধু-বন্ধুকে ভালোবাসে; এখানে কারো উপর কারো প্রাধান্য থাকে না।

(২) শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা, যেমনঃ সন্তান পিতা মাতাকে ভালোবাসে, কিংবা শিক্ষককে তার ছাত্ররা ভালোবাসে। এখানে যে ভালোবাসে, সে যাকে ভালোবাসে নিজের উপর তার প্রাধান্য মেনে নেয়। তাই একজন বাধ্য সন্তান তার পিতামাতার হুকুমগুলোকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়, একজন অনুগত ছাত্র তার শিক্ষকের হুকুমগুলোকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়, টু শব্দও করে না।

(৩) স্নেহ মিশ্রিত ভালোবাসা, যেমনঃ পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে ভালোবাসে, কিংবা শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে ভালোবাসে। এক্ষেত্রে যে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার পাশাপাশি যাকে ভালোবাসে তার উপর প্রভাব এবং প্রাধান্যও বিস্তার করে। ফলে পিতা-মাতা সন্তানকে ভালোবাসে আবার হুকুমও জারি করে, শাসনও করে, ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করে, চোখে চোখেও রাখে ইত্যাদি।

এখন আপনাকে প্রশ্ন করি, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কোন্ প্রকারের ভালোবাসা? বলতে পারবেন?..........

উত্তরঃ স্বামী স্ত্রীকে যে ভালোবাসবে তা হবে স্নেহ মিশ্রিত ভালোবাসা, ফলে সে স্ত্রীকে ভালোওবাসবে, আবার প্রাধান্যও বিস্তার করবে, প্রয়োজনে

শাসনেরও অধিকার রাখবে। অন্যদিকে, স্ত্রী স্বামীকে যে ভালোবাসবে তা হবে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা, তাই স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসার পাশাপাশি শ্রদ্ধা-ভক্তিও করবে, যেমনটি সে তার পিতা-মাতাকে করে, অন্যান্য গুরুজনকেও করে, স্বামীর আনুগত্য করবে, স্বামী তার জন্য যা ভালো মনে করবে, তাকেই সে ভালো মনে করবে, স্বামী তার জন্য যা-ই পছন্দ করবে, সে-ও তাই পছন্দ করবে। এটিই আদর্শ সংসারের মডেল। যদি এর ব্যতীক্রম হয়, তাহলে একশ পার্সেন্ট গ্যারান্টি, সে সংসারে শান্তি আসবে না, আসতে পারে না।

এখন, যারা প্রেম করে বিবাহ করে তাদের ভালোবাসার মধ্যে না স্নেহ থাকে, না শ্রদ্ধা থাকে। এটি হয় বন্ধুত্বের ভালোবাসা।

হায়! বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে 'বন্ধুত্ব' চলে, ডেটিং আর চেটিং চলে, সংসার চলে না, এ ভালোবাসা দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব!!! কেননা, কেউই কাউকে প্রাধান্য দিতে চায় না। ফলে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য মেনে নিতে পারে না। স্ত্রী তার মন মতো চলতেই বেশি ভালোবাসে। সাংসারিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখানেই.....

৭. প্রেম করার মূল তাগিদ আসে মানুষের বায়োলজিকাল প্রয়োজন তথা কামোত্তেজনা হতে। বিয়ে হয়ে গেলে কিছুদিনের মধ্যেই তা প্রশমিত হয়ে যায় এবং তার পার্টনারের প্রতি আসক্তি কমে যায়। ফলে তার প্রতি আগ্রহও কমে যায়, ভয়াবহ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কেননা, বিয়ের আগে যে আগ্রহ প্রদর্শন করা হতো, এখন তার প্রয়োজন না থাকায়, কিংবা কামোত্তেজনা প্রশমিত হওয়ায়, সে আগ্রহ দেখানো হয়ে উঠে না, ফলে সন্দেহ আরো প্রবল হতে থাকে। তখন এটি মনে করাই স্বাভাবিক- সে

আমাকে আগের মতো ভালোবাসে না। অথচ সম্পর্কটা যদি শুধু দৈহিক না হয়ে সাথে সাথে (শরয়ী) আদর্শিক হত তাহলে এই সমস্যা হত না।

৮. অন্যদিকে পার্টনারের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ায় সে অন্য কারো প্রতি মানসিক টান অনুভব করে, বা অন্য কাউকে তার ভাল লাগে। কেননা, মানুষের মন (নফ্স) সবসময় নতুনত্ব চায়। আর নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে তার পার্টনারের প্রতি মনোযোগ কমে যায়, সে এদিক সেদিক তাকাতাকি করে, দেখি, নতুন কাউকে ভালো লাগে কিনা! এভাবে সংসারে অশান্তি শুরু হয়। সমস্যাগুলো কাউকে বলতেও পারে না, কারো সাথে শেয়ারও করতে পারে না। কেবল দু'জনই অনলে দগ্ধ হতে থাকে।

৯. 'লাভ মেরিজের' দম্পত্তির অবস্থা সেই পাবলিক টয়লেটের হাগুকারীর সাথে তুলনা করা যায়, যে টয়লেটের সামনে বিশাল এক লাইন। যারা টয়লেটের বাহিরে আছে, তারা অস্থির হয়ে আছে কখন ভিতরে ঢুকে কাজ সারবে। আর যে বেচারা ভিতরে কাজ সারছে, সে গন্ধের জ্বালায় মুখ চাপড়ে বসে আছে আর অস্থির হয়ে প্রহর গুণছে, কখন বাহিরে বের হবো, কখন কাজ শেষ করে ফারেগ হবো। হা হা হা!

এবার মিলান! যারা প্রেম করছে, এখনো বিবাহ করেনি, তারা শুধু চায়, কখন বিয়ে করব......, কখন মিলন হবে........, কখন মন তৃপ্তি লাভ করবে........???? আর যার যারা 'লাভ মেরিজ' করে ফেলেছে, সংসার গঠন করেছে, তাদের অবস্থা হলো, কবে সংসার থেকে মুক্তি পাবো.......? কেন এতো অশান্তি.......? আর ভালো লাগে না......!!! কবে মরবো......??? যার শেষ পরিণতি হয়তো ডিভোর্স, নয়তো আত্মহত্যা.......!!!

১০. এবার একটু সাইন্টিফিক আলোচনা করতে চাই। জীববিজ্ঞানের ছাত্ররা হয়তো ভালো বুঝবেন। যত দিন প্রেম করেছিল 'সিম্পেথেটিক হাইপার স্টিমুলেশনে' ছিল। এর ফলে যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে প্রিমেচিউর ইজাকুলেশন (সহবাসের সময় দ্রুত বীর্যপাত) হয়। মেয়েদের এমনিতেই তৃপ্তি আসতে বিলম্ব হয়, তার মধ্যে পূর্বেই যদি তার স্বামীর ইজাকুলেশন (বীর্যপাত) হয়ে যায়, তাহলে অতৃপ্তি আরো প্রকট হয়। আর এই অতৃপ্তি হতে শুরু হয় সংসারের অশান্তি। এই সমস্যা দূরীকরণে অনেকে আবার হার্বাল কিংবা এলোপেথিক ঔষধ গ্রহণ করে। যখন সে ঔষধ সেবন করে, তখন হয়ত কিছু ফল পায়, কিন্তু পরিণাম হবে ভয়াবহ। কেননা পরবর্তীতে এমন একটি সময় আসবে যখন এসব ঔষধেও আর কাজ হবে না, আর ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে সে আরো দূর্বল হয়ে যাবে, হার্ট এটাক হয়ে মরবে।

১১. যতদিন প্রেম করেছিল ততদিন একজন আরেকজনের কাছে খুব ভালো থাকার চেষ্টা করে। এ কারণে, একে অন্যের কাছে কোনো দোষ-ত্রুটি সাধারণত প্রকাশ পায় না। বিবাহের পর এর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকায় আগের মত সতর্কাবস্থা আর থাকে না। ফলে একজন আরেকজনের সামনে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়তে থাকে। তখন বিয়ের আগের সময়ের সাথে সে তুলনা করতে থাকে, ফলে আগের তুলনায় তার আচার-আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়- যে বিয়ের আগে আমার সাথে এত ভাল ছিল, সে কেন আমার সাথে এমন করছে? কিংবা বিয়ের আগে সে কেমন ছিল আর এখন জানি কেমন হয়ে গিয়েছে?

১২. যারা প্রেম করে তারা সাধারণত ক্লাসমেট বা সমবয়সীদের সাথেই প্রেম করে এবং কপালে ছ্যাঁকা না থাকলে তাকেই বিয়ে করবে। মেয়েদের চেহারা এক-দুইটা বাচ্চা হলেই নষ্ট হয়ে যায়- বয়স্ক বয়স্ক লাগে। তখন দেখা যায়, স্বামী বুড়া হওয়ার আগেই স্ত্রী বুড়ী হয়ে গিয়েছে। এরপর যা হবে, তা কি আর বলার দরকার আছে?..........

তবে, হ্যাঁ, যারা প্রেম করে বিবাহ করে না, কিংবা শুধু খাহেশাত পুরা করার মানসিকতা নিয়ে সমবয়সী কিংবা নিজের চেয়ে আরো বেশি বয়সের নারীকে বিবাহ করে না এবং নিজের চরিত্রের উপর যাদের নিয়ন্ত্রণ আছে, তাদের সমস্যা হয় না। সবচেয়ে ভালো উদাহরণ, আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ। তিনি যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ আর আম্মাজান হযরত খাদিজা রদিয়াল্লহু আনহার বয়স ছিল চল্লিশ।

১৩. যারা প্রেম করে তাদের অন্তরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার কোনো ভয় থাকে না। ফলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। ফলে আবারো সে অন্য কারো অপেক্ষা করতে থাকে। মনে রেখো, সংসার জীবনে সুখি হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। এজন্যই বিয়ের খুতবাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআন কারীমের বিয়ে সংক্রান্ত কোনো আয়াত পাঠ করতেন না, বরং তিনি যে তিনটি আয়াত পাঠ করতেন তার সবগুলোরই অর্থ "আল্লাহকে ভয় কর"। স্বামী যদি স্ত্রীর হকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে সে তার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তাই করবে, আবার স্ত্রীও যদি স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে সেও আল্লাহকে

খুশি করার জন্য স্বামীর আনুগত্য করবে, তার খেদমত করবে, আল্লাহ তাকে যা যা যেভাবে করতে বলেছেন, তা সেভাবেই সে করবে।

একারণে, দ্বীনদারীর সংসারে কেবল শান্তি আর শান্তি! একজন খাছ পর্দা করনেওয়ালী দ্বীনদার স্ত্রীকে জান্নাতের হুরের সাথে তুলনা করা যায়, যে তার স্বামীকেই কেবল চিনে, অন্য কোনো পুরুষ তার চোখে পড়ে না, ফলে সবটুকু ভালোবাসা আর আবেগ তার স্বামীর জন্যেই মওজুদ থাকে, যে আল্লাহর ভয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে, স্বামীর আনুগত্য করতে এবং স্বামীর সেবা করতে সবসময় ছুটোছুটি করে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, এমন স্ত্রী একজন মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বরং আকাশের নিচে, জমিনের উপরে একজন পুরুষের জন্য এরচেয়ে উত্তম সম্পদ আর নেই। এজন্যই হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু বলেছিলেন, আমার ঘরে যে শান্তি আছে তা যদি রোম ও পারস্যের বাদশাহরা জানতে পারতো, তাহলে সে শান্তি ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তারা আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। সুব্হানাল্লাহ। এটিই চরম বাস্তবতা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না, বা খবর রাখে না- আল্লাহ তাআলা তার অনুগত বান্দাদেরকে সাংসারিক জীবনে কী শান্তি আর মজার যিন্দেগী দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে।

১৪. সাধারণত যারা প্রেম করে অভ্যস্ত তারা একাধিক প্রেমে জড়িত থাকে। বৈবাহিক জীবনে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। যখনই তার পূর্বের অন্য প্রেমিক/প্রেমিকাদের কথা মনে হয়, সে আনমনা হয়ে যায়। তার বর্তমান স্বামী/স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। এর প্রভাব অবশ্যই তাদের জীবনে পড়ে।

১৫. অনেক সময় তার ব্যর্থ প্রেমিক/প্রেমিকাগণ তাদের ক্ষতি করার প্রয়াস পায়। যেমন অনেকে কালো-যাদু (Black- Magic) করে, এতে করে তাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। শারীরিক ক্ষতি হয়। সন্তানাদির ক্ষতি হয়। অনেকে যাদুর প্রভাবে মৃত্যুবরণও করে।

১৬. যেহেতু এই সম্পর্কের শুরুটাই গোনাহের দ্বারা তাই এই সম্পর্কের মাঝে কোনো বরকত, রহমত থাকেনা। তাদের সন্তানদের মাঝে তাদের প্রেমের প্রভাব পড়ে, তাদের সন্তানরা আরো কম বয়সেই প্রেমে লিপ্ত হয়। সে যদি গোপনে প্রেম করে থাকে, তার সন্তান করবে প্রকাশ্যে, তারই চোখের সামনে। সে যদি প্রকাশ্যে প্রেম করে থাকে, তার সন্তান হবে পর্নস্টার, গার্লফ্রেন্ডের সাথে অশ্লীল মুহূর্তের ভিডিও তৈরি করে ভাইরাল করবে। এভাবে প্রেমের দ্বারা ভবিষ্যত প্রজন্ম নষ্ট হচ্ছে।

১৭. এরকম নানা সমস্যার কারণে তার জীবন অভিশপ্ত হয়ে যায়। ফলে সম্পর্ক চালিয়ে না যাওয়ার মাঝেই সে শান্তি খুঁজে পায়। যেই মুখ দিয়ে একবার খুব সহজে বের হয়েছিল-'আমি তোমাকে ভালবাসি', সেই মুখ দিয়ে আরো সহজে তখন বের হয়-'তোমার সাথে চালিয়ে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না'। উপর্যুক্ত এবং আরো বহুবিধ কারণে 'লাভ মেরিজ'গুলো খুব সহজে ডিভোর্স হয়ে যায়।

১৮. এভাবে যখন ডিভোর্স-এর সংখ্যা বাড়তে থাকবে, তখন একটা সময় আসবে যখন মানুষ বিয়ে করা পরিত্যাগ করে 'লিভ টুগেদার' শুরু করবে। আর সমাজ লাভ করবে, অগণিত, অসংখ্য জারজ আর হারামীর বাচ্চা!!! বর্তমানে এটিই পশ্চিমা সমাজের বাস্তব চিত্র। আর বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের যুবকশ্রেণি যেই পথের পথিক!!!

ওহে মুসলমানের বাচ্চারা! সতর্ক হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যতদিন বেঁচে আছ, ততদিন সে তোমাদের জীবনকে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করবে আর মৃত্যুর পর তো দোযখের শাস্তি আছেই। কত নিকৃষ্ট সে আযাব!!! দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীর ধোকায় পড়ো না। নারীর ফেতনা থেকে বাঁচ। এতে কখনোই সুখ নেই, সুখ থাকতে পারে না। শরীয়ত মতে দ্বীনদার, পরিপূর্ণ পর্দা করনেওয়ালী পাত্রী দেখে, তার রূপ সৌন্দর্য দেখে, তোমার পছন্দ হলেই বিবাহ কর, কিন্তু প্রেম করো না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

সতর্কতা: আমার লিখা পড়ে কেউ কেউ আমার প্রতি বদ্-যন্ (কুধারণা) করতে পারেন। কারণ শয়তান তো সবার সাথেই একটি করে আছে। শয়তান মনে ওস্ওয়াসা দিতে পারে, লেখক এত সুন্দর করে প্রেম করার মজা বুঝল কেম্নে? তাহলে কি.........? হা হা হা!!!

না, না, আমি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ি নাই। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। নিজের প্রশংসা করার জন্য নয়, আপনাকে একটি নিশ্চিত কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য বলছি। আসল কথা হলো, আমার আশে-পাশের প্রেমিক-প্রেমিকাদের করুণ পরিণতি আর ‘লাভ মেরিজের’ সংসারগুলো ভাঙতে দেখে খুব কষ্ট হতো, আর এসবের কারণ বুঝার চেষ্টা করতাম আর আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। তো আল্লাহ তাআলাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্হামদুলিল্লাহ!

হস্তমৈথুনের বিপদ:

হস্তমৈথুন করবে না। এটিও গুনাহে কবীরা। হাশরের মাঠে তোমার হাতের আঙুলগুলোকে গর্ববতী বানিয়ে দেয়া হবে। সকল মানুষের সামনে তা বাচ্চা প্রসব করবে। কেমন লজ্জাকর বিষয় হবে সেটি, চিন্তা করো তো!

হস্তমৈথুন করলে তোমার জীবন-যৌবন সব বরবাদ হবে। বৈবাহিক জীবনে অশান্তি পূর্ণ-মাত্রায় ভোগ করবে।

এর কারণ-

✓ হস্তমৈথুন করলে পুরুষাঙ্গের মধ্যভাগ ও অগ্রভাগ অধিক মাংসল ও মোটা হবে, কিন্তু গোড়ার দিকটা স্বাভাবিক চিকন থেকে যাবে। ফলে উত্তেজনার সময়/ সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ বেঁকে যায়। যা স্বামী কিংবা স্ত্রীর পরিতৃপ্ততার পথে বড় একটি অন্তরায়।

✓ ঘন ঘন হস্তমৈথুন করলে যৌনক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, ফলে বিবাহের পর সহবাসের সময় দ্রুত বীর্যপাত হবে। ফলে তুমিও বেশিক্ষণ এই নেয়ামত উপভোগ করতে পারবে না, আর তোমার স্ত্রী তো পরিপূর্ণরূপেই বঞ্চিত হলো।

✓ মনে রেখো, তোমার যেমন চাহিদা আছে, তোমার স্ত্রীরও তেমনি আছে। নিজের কথাই চিন্তা কর, তোমার যদি উত্তেজনা তৈরি হয়, আর তা যদি তোমার স্ত্রী পুরা করতে না পারে, তাহলে তোমার কেমন লাগবে? ঠিক তেমনি তোমার স্ত্রীকে যদি তুমি সন্তুষ্ট করতে না পার, তাহলে তার অবস্থাও ঠিক তেমনি হবে। খুব ভালোভাবে মনে রেখো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংসারিক অশান্তির শুরুটা বিছানা থেকেই হয়।

✓ঘন ঘন হস্তমৈথুন করলে বীর্যের ঘনত্ব কমে যাবে, ফলে শুক্রাণুগুলো কম পুষ্টি পাবে এবং দুর্বল হবে। এই শুক্রাণু হতে যে বাচ্চা হবে সেও হবে অত্যন্ত দূর্বল।

✓বীর্যের ঘনত্ব কম হওয়া বিয়ের পর বাচ্চা না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। বাচ্চা হচ্ছে না তাই শুধু স্ত্রীকে কেন অহেতুক দোষবে? আগে নিজের শুক্রাণু পরীক্ষা করে নাও।

দাসপ্রথা উম্মতের জন্য রহমত ছিল:

দাসপ্রথাকে অনেকে মানবতাবিরোধী মনে করে। এটাকে অনেকে অপছন্দ করে। ভাবে- এর দ্বারা মানবজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, মানবজাতিকে অবমূল্যায়ন করা হয়। বিশেষতঃ দাসীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো নাজুক, আরো স্পর্শকাতর। নারীবাদীদের জন্য এটি চরম চুলকানির কারণ যে, মুসলমানরা অমুসলিম নারীদের ধরে ধরে দাসী-বাঁদী বানায়। অথচ আল্লাহ পাক এটিকে হালাল করেছেন। আল্লাহ তাআলার যে কোনো ছোট থেকে ছোট হুকুমকেও অপছন্দ করা, অবমূল্যায়ন করা নিরেট কুফুরী। যেমন: কেউ পর্দাপ্রথা পছন্দ করলো না, সে কুফুরী করল। কেউ ইসলামের বহুবিবাহ প্রথাকে অপছন্দ করল, সে কুফুরী করল। তেমনিভাবে, কেউ দাসপ্রথাকে অপছন্দ করল, সেও কুফুরী করল। কেননা, আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে কুরআন কারীমে দাসীদেরকে মুসলমানদের জন্য হালাল করেছেন।

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"(সফলকাম তারা) যারা তাদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তবে নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভূক্ত দাসীর ব্যবহার-এটি নিন্দনীয় নয়।"

আর আল্লাহ যে বিষয়কে তাঁর বান্দার জন্য হালাল করেন, সেটাকে কেউ যদি হারাম করে, তাহলে সে কাফের। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

"যে সব লোক আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না (বিধান দেয় না), তারাই কাফের।" (৫ সূরা মায়েদা: ৪৪)

বর্তমানে অনেক মুসলমানকেও দেখা যায়, আল্লাহ পাকের এই বিধান নিয়ে অনেক অসন্তুষ্ট। তারা এই বিধানের হাকীকত বুঝতে না পেরে এর বিরুদ্ধে মুখ খুলে ঈমান হারা হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে কিছু কথা লিখার প্রয়োজন অনুভব করছি।

একটা সময় ছিল, যখন খিলাফত ছিল, মুসলিম মুজাহিদগণ কুফ্ফারদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিত। কবুল না করলে, জিযিয়া কর্ (ট্যাক্স) দাবী করা হত। যদি তারা কর্ দিতে সম্মত হত, তাহলে তাদের নিরাপত্তা মুসলমানরাই দিত। অমুসলিমদেরকে হেফাযতের দায়িত্ব তখন মুসলমানদের উপরই বর্তাত। নাম-মাত্র কিছু ট্যাক্সের বিনিময়ে মুসলমানরা তাদের নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অমুসলিমদেরকে তাদের

শত্রু থেকে হেফাযত করত। তাদের জান-মাল ও সম্ভ্রমের হেফাযত করত। এক্ষেত্রে তাদের নারীদের দিকে মুসলমানরা ভুলেও কখনো তাকিয়ে দেখেনি। অমুসলিম নারীদের সম্ভ্রমকে তারা ততটুকুই মূল্যায়ন করত, যতটুকু তারা মুসলিম নারীদের করত। চিন্তা করুন তো, পৃথিবীতে আরো এমন কোনো ধর্মের লোক আছে, যারা অন্য ধর্মের লোকদেরকে বাঁচানোর জন্য, বিধর্মী নারীদের সম্ভ্রম ও ইজ্জতের হেফাজতের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয়? আবার দেখুন, সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েম করায় সর্বত্র শান্তি আর শান্তি বিরাজ করত। ন্যায়-ইনসাফের এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবী আর কোনো জাতির কাছে পায়নি। আর এসবের বিনিময়ে মুসলমানরা আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাতে প্রতিদান আশা করত। কেননা আল্লাহ পাক এমনি হুকুম করেছেন, সাথে সাথে এমনি ওয়াদা করেছেন। কিন্তু......

যারা ইসলামও কবুল করতো না, ট্যাক্সও দিত না, তাদের সাথে তরবারির ফয়সালা হতো। আল্লাহর সাহায্যে যখন মুসলমানরা অমুসলিমদের কোনো ভূমি দখল করে নিত, তখন আল্লাহর হুকুম হলো- এদের পুরুষদেরকে হত্যা কর, কিংবা বন্দী কর, আর এদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে সকল যুদ্ধ-বন্দীদেরকে দাস-দাসী বানাও। যে সকল মেয়েদেরকে তোমরা গনীমত হিসেবে পেয়েছো, তাদেরকে হয় তোমরা নিজেদের কাছে রাখ, নয়তো অন্য মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দাও। এ সকল নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। অর্থাৎ তোমাদের জন্য হালাল হলো- তোমাদের স্ত্রীগণ এবং এ সকল দাসীগণ। তবে দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। এদের উপর মারধোর করো না, এদের উপর তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজের বোঝা চাপিয়ে দিও না। তাদের উপর যুলুম নির্যাতন করো না। তোমরা যা খাবে এদেরকে তাই খাওয়াবে,

তোমরা যে পোশাক পরিধান করবে, তাদেরকেও তাই পরিধান করতে দিবে। তাদেরকে নিজের পরিবার-পরিজনের মতো মনে করবে। এতে দুনিয়াতে তোমাদের লাভ হলো- তোমরা তাদের দ্বারা কাজ নিবে, তাদের সাথে সহবাস করে তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করবে। গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। অন্য নারীদের দিকে তোমাদের তাকাতে হবে না। পৃথিবী হবে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামুক্ত।

আর তাদের অর্থাৎ দাসীদের লাভ হলো- তারা তোমাদের দ্বারা নিরাপত্তা লাভ করবে। সম্মানজনক ভাবে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেননা পতিতাবৃত্তির চাইতে কারো অধীনে থেকে যিন্দেগী যাপন করা অনেক সম্মানজনক। কেননা, বিবাহিত স্ত্রীদের পরই দাসীদের স্থান। আর তাদের গর্ভে তোমাদের যে সন্তান হবে, তারা কিন্তু তোমাদের দাস/দাসী নয়; এসব সন্তানেরা তোমাদের মতই স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। এরা তোমাদেরই সন্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় লাভ হলো- তারা তোমাদের মাধ্যমে ইসলামের সন্ধান পাবে। ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করবে। কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করবে। ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করবে। মুসলমান হয়ে যাবে। চিরতরে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। চিন্তা করো তো, সে যদি কুফ্ফার স্বামীর কাছে থাকত (কিংবা দাস হলে কুফ্ফার ভূমিতে থাকত), তাহলে কি সে এ নিয়ামত লাভ করতে পারতো? মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হতো, আর সে এ মহা বিপদ থেকে কিসের উসীলায় রক্ষা পেল? তা কি দাসপ্রথা নয়?

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা সেই সব লোকদের প্রতি খুশি হন, যারা শিকলাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করে।” (বুখারী)

অর্থাৎ তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে দাস-দাসী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরে জান্নাতে প্রবেশ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য।” (০৩ সূরা আলে ইমরান: ১১০)

হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “তোমরা মানুষদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তোমরা মানুষদেরকে তাদের গলায় শিকল পরিয়ে বন্দী কর, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে।” (সহীহ আল বুখারী)

দাসীদের জন্য আরো লাভ হলো, তারা যদি ইসলাম কবুল করে, তাহলে ইচ্ছে করলে তোমরা (মুসলমানরা) তাদেরকে মুক্ত করে বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পার। তখন তো সে পূর্ণরূপে তোমাদেরই একজন হয়ে গেল। আর যদি সে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও তাকে আযাদ তথা মুক্ত না করে দাসী হিসেবেই রেখে দাও, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে আখিরাতে দ্বিগুন সওয়াব দিবেন। কেন? সে একই সাথে দুই মনীবের দাসত্ব করেছে, এ কারণে। এক. তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দাসত্ব সে মেনে নিয়েছে, দুই. সে দুনিয়াতে একজন মুসলমানকে মনীব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তাই তার দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন।

অতএব, একটু চিন্তা কর, তোমার এই দাসীটি আজ কেবল মাত্র ‘দাসপ্রথার’ কারণেই দুনিয়াতেও মর্যাদার যিন্দেগী লাভ করল। আর

ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগে (যা সে কাফের স্বামীর কাছে থাকা অবস্থায় কখনো লাভ করতে পারতো না) যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তো তার সৌভাগ্যের সীমাই নেই। কেবল দাসপ্রথার বদৌলতে আখিরাতে সে পরম শান্তির স্থান 'জান্নাত' লাভে ধন্য হবে।

তাই, 'দাসপ্রথা' যিন্দাবাদ!!!! যিন্দাবাদ!!!!!

দাসপ্রথা বিলুপ্তিতে উম্মতের কী ক্ষতি হলো:

'দাসপ্রথা বিলুপ্তি' অভিশপ্ত শয়তানের একটি চক্রান্ত। এই প্রথার বিলুপ্তি উম্মতের জন্য একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, তাহলে কি যুব সমাজ এভাবে ধ্বংস হতো?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, যুবকরা কি গার্লফ্রেন্ড নামক আগুনে ঝাঁপ দিত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, মুসলমান সন্তানেরা কি প্রেম নামক গুনাহে লিপ্ত হতো, তাদের জীবন-যৌবন নষ্ট করত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, উম্মত কি যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হতো? পতিতালয়ে যেত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, কোনো মুসলমান কি বাড়ির কাজের মেয়েকে ধর্ষণ করত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, যুবকরা কি সারাদিন মোবাইল টিপাটিপি করত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, যুবকরা কি সারারাত গার্লফ্রেন্ডের সাথে মোবাইলে কথা বলত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, মুসলমানের বাচ্চারা কি পশ্চিমা পতিতাদের নগ্ন মুভ্যি আর পর্ন দেখার নেশায় উন্মত্ত হয়ে যেত?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, তাহলে কি এসব সুন্দরী পশ্চিমা ললনারা মুসলমানদের ঘরে থাকতো না?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, মুসলমানরা কি তাদেরকে হালাল ভাবে ভোগ করতে পারতো না?

আজ যদি 'দাসপ্রথা' থাকত, ইহুদী-নাসারা আর মুশরিকরা কি উম্মতের যুবসমাজকে সহজ শিকার বানাতে পারতো? পারতো না।

এককথায়, উম্মতের যুব সমাজের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ, দাসপ্রথার বিলুপ্তি।

তাই আবারো, 'দাসপ্রথা' যিন্দাবাদ!!!! যিন্দাবাদ!!!!!

࿊ দাসপ্রথা আবারো আসছে.........:

কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত এই যে, শেষ যামানায় আবারো দাসপ্রথা চালু হবে, ইন্‌শাআল্লাহ। যেমনঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "(কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে,) দাসীর গর্ভ থেকে মনিব জন্মগ্রহণ করবে।" (মুসলিম-১০৬)

এ হাদীসের অনেকগুলো ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হলো, একজন স্বাধীন মুসলমানের দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে স্বাধীন। পিতা জীবিত থাকলে মাতা এখনো দাসী-ই রয়ে গেছে। এভাবে পুত্র মনিব-তুল্য হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, দাসীরা রাজকুমার জন্ম দিবে। রাকুমার বড় হয়ে রাজা হলে মাতা তার প্রজার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

এক কথায়, দাসপ্রথা কিয়ামতের আগে আবার আসবে।

হাদীসে এও এসেছে, "মুসলমানরা রোম জয় করবে, তাদের ক্রুশ ভেঙে ফেলবে, ইসলামের কালো পতাকা উত্তোলন করবে, এবং রোমান মেয়েদের দাসী বাদী বানাবে।"

খুব শীঘ্রই হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর আবির্ভাব হবে ইনশাআল্লাহ। তখন মুসলমানরা সারাবিশ্ব জয় করবে এবং সারাবিশ্বে আবারো দাসপ্রথা কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ......

কারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান???

মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলো তারা-

যারা নিজের কামরিপুর পূঁজা করে না.....

যারা নিজের চাহিদাগুলোকে আখিরাতের জন্য রেখে দেয়.....

যারা হূরে ঈন আর হূরে লু'বাদের পাওয়ার আশায় দুনিয়ার নারীদের দিকে দৃষ্টি দেয় না.....

যারা শাহাদাতের তপ্ত তামান্না নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে.....

যারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নারীর মোহের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাতকে বিক্রি করে না.....

যারা গুনাহে লিপ্ত না হয়ে নিজের যিন্দেগীকে পাক-সাফ রাখে.....

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র করে দেন। আমীন।

অন্তরের গুনাহ থেকে বাঁচা

অন্তরের ব্যাধি ও দোষনীয় বিষয়সমূহের সংখ্যা অনেক। এসব নিন্দনীয় ব্যাধি থেকে অন্তরকে পবিত্র করতে হলে যেমন দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন, তেমনি এর সূক্ষ্ম ও সুকঠিন চিকিৎসা পদ্ধতি নিরূপণ করার জন্যে গভীর ইল্‌মের প্রয়োজন। সহজভাবে মনে রাখবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আত্মার সকল গুনাহের উৎস একটি আর তা হলো দুনিয়ার মহব্বত। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে এবং দুনিয়া ছাড়তে পেরেছে, তার জন্য এসব আত্মার পাপাচার থেকে বাঁচা অত্যন্ত সহজ। আর যে দুনিয়ার লোভ এবং মহব্বত ছাড়তে পারে নি, তার ইল্‌ম এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহবত লাভ কোনো উপকার পৌঁছাতে পারবে না। আত্মার সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো- দুনিয়ার মহব্বত, যা অন্য সকল গুনাহের মা। এ সম্পর্কে আমি আমার লিখিত "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী: গরীব ইসলাম", দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি আপনাদের সামনে অতি সংক্ষেপে মারাত্মক আরো তিনটি আত্মিক ব্যাধি নিয়ে আলোচনা পেশ করব। এগুলোও মূলত দুনিয়ার মহব্বতের সন্তান-সন্তুতি। যদি এ ব্যাধিগুলোকে দমন করা যায়, তাহলে অন্যান্য ব্যাধিগুলো থেকে বাঁচা কঠিন হবে না। দুনিয়ার মহব্বত ছাড়ার সাথে সাথে সকল বাহ্যিক ও আত্মিক ব্যাধিও বিদায় নিবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

০১. হিংসা

হিংসার উৎপত্তি হয় কৃপণতা এবং দুনিয়ার লোভ থেকে। কেননা, কৃপণ ব্যক্তি নিজের অধিকৃত সম্পদ অন্যের জন্যে খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় আর হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের ব্যাপারে কার্পণ্য করে; অথচ এসবে তার নিজের কোনো অধিকার নেই, সম্পূর্ণ আল্লাহর ভাণ্ডারের জিনিস। সুতরাং হিংসুকের লালসা নিশ্চিতভাবে মারাত্মক।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে যখন কোনো বান্দাকে জ্ঞান, সম্পদ, মান-মর্যাদা বা অন্য কোনো নিয়ামত দান করেন, আর তখন যতি তোমার অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয়, আর তুমি যদি চাও যে, তার এসব নেয়ামত যদি না থাকত, কিংবা তার এ নেয়ামত যদি ধ্বংস হয়ে যেত, তাহলে তুমি হিংসা করলে। এটি চরম পর্যায়ের হীনতা ও ভ্রষ্টতা।

এর দ্বারা তুমি মূলত আল্লাহ তাআলার ফয়সালাকেই অপছন্দ করলে। আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দাকে একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং দিয়েছেন, আর তুমি তা অপছন্দ করছ? তুমি অপছন্দ করার কে? তিনি তো ইচ্ছা করলে তোমাকেও দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। ধরে নাও, এতেই তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যদি ভবিষ্যতে এর মাঝে কোনো কল্যাণ আল্লাহ রেখে থাকেন, তাহলে হয়তো তোমাকে ভবিষ্যতে দিবেন, নয়তো দিবেন না। অন্য কোনো বিষয়ে যদি তোমার জন্য খায়ের থাকে, তাহলে তিনি তোমাকে অন্য কিছু দিবেন। তাই আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তাকে খুশি করার চেষ্টা কর, দুনিয়াতে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, “হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়।” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তুমি যদি হিংসাতুর হও, তাহলে প্রতি মুহূর্তেই তোমাকে অন্তর্জ্বালাতনের শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তোমার প্রতি কেউ করুণার দৃষ্টি দিবে না। কেননা, এই পৃথিবীতে তোমার পরিচিত এবং সমকালীনদের মধ্যে বহু লোক এমন আছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান, সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছেন; তখন এদেরকে দেখে তুমি প্রতিনিয়ত অন্তর্জ্বালা ও মনকষ্ট ভোগ করতে থাকবে। এভাবে মরণ পর্যন্ত তোমার উপর আল্লাহ পাক এই শাস্তি অব্যাহত রাখবেন। অতঃপর আখিরাতের আযাব তো আছেই, যা আরও মারাত্মক ও মর্মন্তুদ।

বস্তুতঃ তুমি ঐ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অপর মুসলমান ভাই/বোনের জন্য তা পছন্দ করতে না পার; অপরের সুখে-দুঃখে, আনন্দে-আপদে সমান অংশীদার হতে না পার।

মনে রেখো, গোটা মুসলিম জাতি একটি প্রাসাদতুল্য, যার এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভর করে। অনুরূপ, তারা একটি দেহসদৃশ, যার একটি অঙ্গ যদি ব্যথিত হয়, তাহলে গোটা দেহই অভিভূত হয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ দিকে তাকিয়ে দেখ, তিনি কিভাবে উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত থাকতেন। আজ সারা দুনিয়ায় উম্মত মার খাচ্ছে সেদিকে তোমার কোনো খেয়াল নেই, আর তুমি ধান্দাবাজি করছ, কে তোমার চেয়ে বেশি দুনিয়া পেল- এজন্য তুমি ব্যথিত হচ্ছো। অমুকে গাড়ি-বাড়ি করে

ফেলেছে, তুমি করতে পারলে না; অমুকে ডিগ্রি করে ফেলেছে, তুমি করতে পারলে না.....!!! আর তুচ্ছ এ দুনিয়ার জন্য তুমি যার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ লালন করছ, সে কি তোমার নবীর উম্মত নয়? তাহলে কেন তুমি তার ক্ষতি কামনা করছ? কেন তার অনিষ্ট চিন্তা করছ? এ মুখ নিয়ে তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে কী করে? এ মুখ তুমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখাবে কি করে? তোমার তো উচিত ছিল উম্মতের জন্য যান-মাল সব কুরবানী করে দেয়া, তা না করে তুমি চিন্তা করছ, অমুক উম্মতের যদি এটা না থাকত, সে যদি এটার মালিক না হতো.......!!!

সুতরাং আফসোস তোমার জন্য....!!! তুমি যা করছ তার জন্য....!!!

আরে তুমি তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য হিংসা করছো?......

তোমার তো এজন্য আফসোস করার দরকার ছিল যে, অনেক আল্লাহর বান্দারা দ্বীনের লাইনে তোমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে, তুমি তাদের ধারে কাছেও যেতে পারনি.....

অনেকে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করে তার কাছে চলে গিয়েছে (শাহাদাত বরণ করেছে), কিন্তু তুমি তো তা অর্জন করতে পারনি......

আরো কতো বান্দাকে আল্লাহ পাক গোপনে কত কী দিয়েছেন, কত মর্তবা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার খবরও তোমার কাছে নেই, এসব নিয়ে তোমার আফসোস নেই কেন?........

আসল কথা হলো, আমরা দুনিয়ার লোভ ছাড়তে পারিনি, আর আখিরাতকে এখনো চিনিনি.... ইসলাম আমাদের মাঝে প্রবেশ করেনি....

০২. রিয়া

রিয়া মূলতঃ গোপন শিরক, যা মুসলমানরা করে থাকে। আর প্রকাশ্য শিরক হলো মূর্তিপূজা। দুনিয়ার মানুষের কাছে মান-মর্যাদা, সুযশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লিপ্সাই হচ্ছে এর মূল উৎস। এটিও দুনিয়ার মহব্বতের একটি সন্তান। শুধু এ ব্যধির কারণেই অনেক আলেম, শহীদ, গাজী, মুবাল্লিগ আর বুযুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আফসোস! একই রক্ত-মাসের মানুষ অপর মানুষকে সাধুতা দেখাতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সাধারণ দ্বীনী প্রতিটি কাজকর্মে, ইসলাহী মেহনতে, ইবাদতে, ইলমী ময়দানে, দাওয়াতের ময়দানে, জিহাদের ময়দানে, দান-খয়রাত করার ক্ষেত্রে- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রিয়া বা লোক দেখানো মনোবৃত্তি কাজ করছে। আর নিঃসন্দেহে এ মনোবৃত্তিই আমাদের সকল ইবাদতগুলোকে নীরবে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আমাদের ইবাদতগুলি যে রিয়ায় ভরপুর তার কিছু লক্ষণ হলো- যদি কেউ আমাকে সালাম না দেয়, তাহলে কষ্ট অনুভূত হয় (বুযুর্গগিরি); আমাকে যদি মেহনতের বা জামাতের জিম্মাদারী না দেয়া হয়, তাহলে মনে ব্যথা লাগে (প্রভুত্বপ্রীতি); আমি ভাল বয়ান করতে পারি, কিন্তু আমাকে বয়ান করতে না দিলে দীলের মধ্যে চোট লাগে (নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা); আমার সামনে যদি আমার মুরুব্বী আমার আরেক সাথীর প্রশংসা করে কিংবা যদি আমার প্রশংসা না করে, তাহলে আমার কেমন জানি লাগে (তার মানে, আমি লোকের প্রশংসার জন্য মেহনত করি), আমি আজকের অভিযানে এত কষ্ট করলাম, এত বীরত্ব দেখালাম কিন্তু কেউ একবারও আমার কথা আলোচনা করলো না (প্রশংসাপ্রীতি); আমি মজলিশে

আসলাম কিন্তু কেউ আমার জন্য জায়গা করে দিলো না, তাই খারাপ লাগল (যশলিপ্সা); আমি এতটাকা দান করলাম কিন্তু আমার নাম মাইকে ঘোষণা দেয়া হলো না, মনে আঘাত খেলাম (খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা); এত টাকা খরচ করে হজ্জ করে আসলাম, কেউ আমাকে হাজী বলে না, তাই কষ্ট পেলাম (যশলিপ্সা); এসবই হচ্ছে রিয়ার আলামত। এগুলো যার মধ্যে আছে, সে যতই ইবাদত বন্দেগী করুক, সে গোপন শিরকের গুনাহতে লিপ্ত। তাই খুব তাওবা করা চাই।

হুযুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন যুদ্ধে শহীদ এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হলে সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে বীর যোদ্ধা বলুক; আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এটাই তোমার পুরস্কার (যা তুমি দুনিয়াতেই পেয়েছ)।" এই একই ধরণের কথা আলেম, হাজী, কারী, মুফতী, দাতাদেরকেও বলা হবে। (মুসলিম)

একবার জনৈক বেদুইন হুযুরে আকরাম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে, কিংবা মানুষকে নিজের বীরত্ব দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা মানুষের নিকট সুখ্যাতি বা প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তার সম্পর্কে আপনি কী বলেন?" হুযুর ﷺ উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ তাআলার কালেমা তাওহীদকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, কেবল সেই আল্লাহর পথে আছে।"

আরেকবার নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি উটের রশি পাওয়ার আশায় যুদ্ধে যোগদান করে, তার কপালে রশি ছাড়া আর কিছুই নাই।"

মনে রেখ, মানুষ মূলতঃ তিন কারণে রিয়া করে- এক. সুখ্যাতি ও প্রশংসা প্রীতি; দুই. নিন্দা ভীতি, আর তিন. মানুষের নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

ইবাদত করার ক্ষেত্রে লোকের প্রশংসা বা সুখ্যাতি আকাঙ্ক্ষা করবে না আর কারো নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না। সবসময় মনে করতে থাকবে- যদি আমি আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হতে না পারি তাহলে লোকের প্রশংসায় কী আসে যায়! সারা দুনিয়ার মানুষ প্রশংসা করে যদি আমাকে মাথায় তুলে রাখে, আর আল্লাহ যদি আমার দিকে ফিরে না তাকান, তাহলে এ সবের কী ফায়দা? অন্যদিকে, আমি যদি আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয়ে যাই, তিনি যদি আমার ইবাদতগুলোকে কবুল করেন তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষ আমাকে যত পারে নিন্দা করুক, আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিক, তাতেই বা আমার কী আসবে যাবে!!! আর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমার আমলের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ী যে নিয়ামত দিবেন তাকে বিক্রি করে দিও না। দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ো।

যদি তুমি বুঝতে পারো যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে কেউ প্রশংসা করলে তোমার ভালো লাগে আর নিন্দাবাদ করলে খারাপ লাগে (অর্থাৎ অন্তরে রিয়ার বীজ বিদ্যমান), সেক্ষেত্রে তোমার তাওবা করা ফরয।

রিয়ার তাওবা এই যে, অন্তরের উৎপন্ন অবস্থাকে কঠোরভাবে ঘৃণা কর।

আর ঘৃণা করার সাথে সাথে আল্লাহকে বল- "হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি চাই তুমি ছাড়া আর কারো জন্য ইবাদত না করতে, কিন্তু আমার অন্তরে রিয়ার উপস্থিতি টের পাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর। রিয়ার ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা কর। রিয়ার প্রতি আমার অন্তরের ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে দাও। আমীন।"

ব্যাস, তাওবা হয়ে গেল। আর তুমিও রিয়ার ক্ষতি থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। আল্লাহ পাকের শোকর যে, এত ভয়াবহ, কঠিন একটি গুনাহের তাওবাকে এত সহজ করেছেন। আসলে ব্যাপার হলো, মানুষের অন্তরে প্রশংসাপ্রীতি, যশলিপ্সা এগুলো প্রকৃতিগত। তাই এগুলো নির্মূল সম্ভব নয়। তাই অন্তরে ঘৃণা পোষণ করলে আর মাফ চাইলেই তাওবা হয়ে যায়। কঠিন ও সতর্কতার বিষয় হলো, কখন আমার হৃদয়ে রিয়া উৎপন্ন হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা। তাই প্রতিটি ইবাদতের সময়ই নিজের দীলের হালতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি আমলের ক্ষেত্রেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের জন্য রিয়া থেকে বাঁচা সহজ করে দিন। আমীন।

০৩. আত্মসমর্থন (নিজেকে নিজে খুব ভালো মনে করা) অহংকার ও দাম্ভিকতা

এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এই রোগে আক্রান্ত রোগী নিজেকে আত্মগৌরব ও আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে দেখে এবং অপরকে হীন ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিবেচনা করে। এর ফলে সে আমি........ আমি......... প্রলাপ বকতে থাকে, যেমন বকেছিল অভিশপ্ত ইবলিশ, পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

"আমি তার (হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের) চেয়ে ভালো, আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে।" (০৭ সূরা আরাফ: ১২)

উক্ত ব্যাধির ফলশ্রুতিতেই সমাজে কোনো বৈঠকে বা আলোচনা মজলিশে নিজের বড়াই-অহংকার ও আত্মম্ভরিতার মাধ্যমে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা ও সুযশ প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস চালানো হয়, শীর্ষ-স্থানীয় হওয়ার বা সভাপতিত্বের আসন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, কেউ তার কোনো কথার প্রতিবাদ করলে রাগ-গোস্সা করা হয়। সে নিজে কাউকে উপদেশ দিলে মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে, আর অন্য কেউ তাকে উপদেশ দিলে ঘৃণা করে; মেজাজ খারাপ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

জেনে রাখ, যে কোনো ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কোনো মাখলূখের তুলনায় উত্তম মনে করবে, সে-ই দাম্ভিক।

যে অন্যকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করে, সে-ই অহংকারী।

বস্তুতঃ তোমার এ কথা মনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি আখিরাতের জীবনে আল্লাহর কাছে ভাল, সে-ই প্রকৃত ভাল; আর এটা এমন এক বিষয়, যা অদৃশ্য এবং জীবনের শেষ মুহূর্তের উপর নির্ভরশীল।

অতএব, তোমার নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করা নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। বরং তোমার উচিত অন্যের প্রতি যখন তাকাবে, তখন এই ধারণা এবং মন-মানসিকতা নিয়ে তাকাবে যে, সে তোমার চেয়ে ভালো এবং শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং-

যখন কোনো শিশু বা তোমার চেয়ে অল্প বয়স্ককে দেখ, তখন ভাববে, এই শিশু-বাচ্চা আল্লাহর কোনো নাফরমানী করে নাই; কিন্তু আমি করেছি, অতএব, সে আমার চেয়ে ভালো।

তোমার চেয়ে বেশি বয়স্ক কোনো লোককে দেখে ভাববে, এই ব্যক্তি আমার আগে থেকেই আল্লাহর বন্দেগী করে আসছে, অতএব, সে অবশ্যই আমার চেয়ে ভালো।

যদি কোনো আলেম ব্যক্তিকে দেখ, তাহলে ভাববে, তিনি যা কিছু (ইলমে ওহী তথা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান) পেয়েছেন, আমি তা পাইনি; তিনি যে মর্যাদায় পৌঁছেছেন, আমি সেখানে পৌঁছতে পারি নাই; তিনি বিদ্বান, আমি মূর্খ; তার ঘুমও আমার ইবাদতের চেয়ে উত্তম; তিনি তো আল্লাহর খাছ পরিবারভূক্ত লোক, আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ, নায়বে নবী; হাশরের ময়দানে নবীদের পরেই তার অবস্থান হবে; আমার তো সে রকম কোনো যোগ্যতা নেই; তাহলে কী করে আমি তার সমকক্ষ হতে পারি?

যদি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের কোনো সাথী ভাইকে দেখ, তাহলে ভাববে, এই ভাই হয়ত অনেক দিন যাবত এই মোবারক মেহনতের সাথে লেগে আছেন; হয়ত এই ভাইয়ের উসীলায় অনেক মানুষ দ্বীনের উপর উঠেছে; আর উনার নাজাতের জন্য তো একজন মানুষ হেদায়াত পেলেই যথেষ্ট; হায়! আমি তো তেমন কোনো মেহনত করিনি, করলেও আমার মেহনত কবুল হবে কিনা জানি না; তাই তিনিও আমার থেকে উত্তম।

যদি সুলূকের লাইনে মেহনত করনেওয়ালা কোনো ভাইকে দেখো, তাহলে ভাববে, এই ভাই একজন আল্লাহওয়ালার সোহবতে আছেন, গুনাহ ছাড়ার মেহনত করছেন, হয়ত তিনি আল্লাহর কাছে নিষ্পাপ হয়েছেন, না জানি আল্লাহ পাকের কাছে উনার কত মর্তবা, হয়ত তিনি সারারাত নামায পড়েন, দিনের বেলা রোযা রাখেন; হতে পারে তিনি বেলায়েত হাছিল করেছেন, আল্লাহর ওলীদের তালিকায় তার নাম উঠে গেছে; আল্লাহর ওলীরা তো তাঁর কুদরতী চাদরে ঢাকা থাকে, ফলে মানুষ তাদের চিনতে পারে না; আর আমি তো এক গুনাহগার বান্দা, কত গুনাহ করেছি, এই ভাইয়ের সাথে তো আমার কোনো তুলনাই চলে না, আমি কত নাদান, অযোগ্য! আমার কী হবে?

যদি কোনো মুজাহিদ ভাইকে দেখ, তাহলে ভাববে, তিনি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তাআলার ফরয হুকুম বাস্তবায়ন করতে ময়দানে লড়ে যাচ্ছেন, বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন; হয়ত তিনি শহীদ হয়ে চিরজীবন লাভ করবেন; কিন্তু আমি তো তেমন কিছুই করতে পারছি

না, জিহাদের ময়দানে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আমার পরিণতি কী হয়, কে জানে? আমার কপালে কি শাহাদাত আছে কিনা তাতো আমার জানা নেই; শহীদ হলেই যে মকবুল হবো, তা তো আমার জানা নাই; তাই আমার চেয়ে সেই মুজাহিদ ভাইয়ের মর্তবা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তিকে দেখ, তাহলে ভাববে, এই লোকটি নাফরমানী করে থাকলে অজ্ঞতাবশতঃ করেছে, আর আমি আল্লাহর নাফরমানী করেছি জেনে শুনে, সুতরাং আল্লাহর শাস্তি আমার ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য; আমি জানি না, শেষ পরিণতি কার ভালো হয়, আমারই না তার।

যদি তুমি কোনো ফাসেককে গুনাহ করতে দেখ, তাকে গুনাহ থেকে বারণ করবে, কিন্তু ভাববে, এই লোকটি এখন হয়ত গুনাহ করছে, খুব শীঘ্রই হয়তো এমন তওবা করবে যে, আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে; সে যত গুনাহ করেছে, তার তওবার কারণে আল্লাহ পাক সব নেকী দ্বারা বদল করে দিবেন; অন্যদিকে আমি হয়তো এই গুনাহটা করি না, যা এই লোকটা করছে, কিন্তু আমি তো আরো অনেক, অন্যান্য কবীরা গুনাহ করে ফেলি, আর আমার তওবা কবুল হচ্ছে কিনা আমি তো জানি না, শেষ পরিণতি আমার কী হবে, তা তো আমার জানা নেই; তাই এই ফাসেক ব্যক্তিও আমার চেয়ে ভালো।

যদি তুমি কোনো কাফেরকে দেখ, তাহলে ভাববে, আমি জানি না, হয়তো বা সে মুসলমান হয়ে যাবে এবং তার জীবনাবসান নেক আমলের মধ্য দিয়ে হবে এবং ইসলাম গ্রহণের উসীলায় তার সকল পূর্ব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে; আর আমি, আল্লাহ না করুন, হয়তো বা গোমরাহ হয়ে যেতে পারি, যার ফলে কুফর-শিরক ও পাপে লিপ্ত হয়ে আমার মৃত্যু হতে পারে;

সুতরাং পরিণামে সে হয়তঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে আর আমি শাস্তি ভোগকারীদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

যখন কোনো পশু-পাখি বা উদ্ভিদ দেখতে পাও, তখন ভাববে, হায়! এরাও আল্লাহর মাখলূক, আর আমিও আল্লাহর মাখলূক, এদের তো কোনো হিসাব নেই, জাহান্নামের ভয় নেই; কিন্তু আমার তো জাহান্নামের ভয় আছে; আল্লাহ না করুন, আমি যদি জাহান্নামে যাই, তাহলে তো আমি এসব কুকুর, বিড়াল, শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট।........

মনে রেখ, তোমার অন্তর থেকে অহমিকা দূর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তুমি এ কথা বিশ্বাস কর যে, প্রকৃত নেক ও মহৎ ব্যক্তি সে-ই, যে আল্লাহর কাছে প্রিয়; আর আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে একমাত্র মৃত্যুর সময়ের অবস্থার উপর, আর মৃত্যুর সময় কার কী অবস্থা হবে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। শেষ পরিণতি সম্পর্কে তোমার এই আশঙ্কা ও সম্ভাবনার অনুভূতিই তোমাকে অহংকার থেকে ফিরিয়ে রাখবে। তুমি বর্তমানে সততার উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত আছো বলে ভবিষ্যতে যে তোমার কোনো পরিবর্তন হবে না, একথা মনে করো না; কারণ, অন্তরের পরিচালক আল্লাহ তাআলা; যাকে ইচ্ছা তিনি সঠিক পথে হেদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ধ্বংস করেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বাহ্যিক ও আত্মিক সকল প্রকারের ব্যাধি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তাওবা

পাপ কাজ হতে অনুতাপের সাথে ফিরে আসা এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সৎপথের দিকে ধাবিত হওয়াকে 'তাওবা' বলে।

তাওবার ফযীলত:

- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"ওহে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তাআলার সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (২৪ সূরা নূর: ৩১)

অর্থাৎ যারা সফলতা লাভ করতে চাও তারা সকলেই আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা কর যে, জীবনে আর গুনাহ করবে না, আল্লাহ তাআলার পথে জীবন পরিচালনা করবে।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজের পাপাচারণের জন্য তওবা করবে, তার তওবা কবুল হবে।"
- রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "আমি প্রতিদিন ৭০ বার তওবা করে থাকি।"

(আল্লাহু আকবার! নবীজী ﷺ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও, যাঁর দ্বারা জীবনে গুনাহ হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না, তিনিই যদি সত্তর বার তওবা করে থাকেন, তাহলে আমাদের কি করা উচিত?)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও একদিন ইরশাদ করেন, "পাপ কাজ করে না এমন কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার পর তওবা করে, সে ব্যক্তি সকল পাপীদের মাঝে উত্তম।"
- এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে তা হতে তাওবা করে, সে ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেন সে পাপ কাজ করেই নাই।" আর "পাপ কাজ হতে তাওবা করে পুনরায় কখনও সেই পাপের নিকটবর্তী না হওয়াকেই প্রকৃত তওবা বলে।"

[সূত্রঃ কিমিয়ায়ে সাআদাত, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, তওবা অধ্যায়]

তাওবা হচ্ছে চার প্রকারের কাজের সমষ্টিঃ

১. **অতীত কালের সাথে সংশ্লিষ্টঃ** পূর্বের জীবনে আল্লাহ তাআলার যত নাফরমানী করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার আদিষ্ট যে কাজগুলো করা হয়নি, সেগুলোর জন্য মনে-প্রাণে অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাওয়া।

২. **বর্তমান কালের সাথে সংশ্লিষ্টঃ** সগীরা, কবীরা সকল প্রকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ ও অন্তরের নাফরমানীমূলক কাজ পরিত্যাগ করা এবং যে হুকুমগুলো মানা হত না সেগুলো করা শুরু করা। যেমনঃ আগে নামায না পড়লে বর্তমানে পড়া শুরু করা, আগে রোযা না রাখলে এখন

থেকে রোযা রাখা শুরু করে দেয়া, হজ্জ বা যাকাত আদায় না করে থাকলে হজ্জ করা বা হিসেব করে যাকাত দেয়া ইত্যাদি। আগে জিহাদ পরিত্যাগ করে থাকলে, বর্তমানে জিহাদ করা। হারাম রোজী পরিত্যাগ করে হালাল রোজীর সন্ধান করা। (এটি ইবাদাত কবুলের প্রথম শর্ত)। ব্যাংকের চাকরী, সুদের লেনদেন হয় এমন যে কোন চাকুরী, হারাম এলকোহল (ইথাইল এলকোহল বা ইথানল) রয়েছে এমন দ্রব্যাদির ব্যবহার, বিক্রয়, ব্যবসা ইত্যাদি বর্জন করা। ত্বগুতের সহযোগী হওয়া বা যে কাজে ত্বগুতের অস্তিত্ব টিকে থাকে এমন কাজ বা চাকুরী না করা। যেমন: ত্বগুত গণতান্ত্রিক/সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রশাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ এক কথায় যেসব বিভাগের উপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেসব বিভাগে চাকুরী করাও কুফুরির শামিল। যেহেতু কুফরকে সরাসরি আশ্রয়, লালন ও প্রতিরক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য যে সব বিভাগের সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, বরং জনগণের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যেমনঃ চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি, এগুলোতে চাকরী করা যেতে পারে, তবে না করাটাই উত্তম। এতেও সরকারের গোলামী করা হয়। এসব চাকুরী পরিত্যাগ করা।

৩. **ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত:** জীবনে আর গুনাহ বা নাফরমানী করব না, আর হুকুম ভঙ্গ করবনা, নামায যে ধরেছি তা আর ছাড়ব না, আর রোযা ভাঙব না, নিয়মিত যাকাত দিব, জিহাদ পরিত্যাগ করব না ইত্যাদি- এই ধরণের সংকল্প করা।

৪. **ক্ষতিপূরণ করা:** আল্লাহ তাআলার হক গুলির কাযা আদায় করা, যেমন কাযা নামায, কাযা রোযা আদায় করা, কাযা যাকাত ও হজ্জ আদায় করা ইত্যাদি। বান্দার যেসব হক নষ্ট হয়েছে সেগুলো আদায় করা, যেমন: পিতা-মাতার খেদমত করা, স্ত্রী-সন্তানের অধিকার দেয়া, অন্যান্য মানুষের হক নষ্ট হয়ে থাকলে তা আদায় করা, ওয়ারিশী সম্পদ আত্মস্যাৎ করে থাকলে তা হকদারদের বুঝিয়ে দেওয়া, কারো টাকা-পয়সা মেরে খেলে তা পরিশোধ করে দেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, সুদ পরিত্যাগ করা, কেবল আসল নিয়ে নেয়া, হাতে সুদের টাকা থাকলে সওয়াবের নিয়ত না করে মাসজিদের/মাদরাসার শৌচাগার/পাবলিক টয়লেট বানিয়ে দেওয়া। হারাম চাকুরী পরিত্যাগ করতঃ অন্যান্য হালাল রোজী-রোজগারের ব্যবস্থা করা। যে আগে বেশী গান-বাজনা করত সে এখন বেশী করে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করবে বা তিলাওয়াত শুনবে। আগে কৃপণতা থাকলে বর্তমানে বেশি করে দান-সদকা করবে ইত্যাদি।

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। আমীন।”

ঋণ পরিশোধ করার গুরুত্বঃ

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "ঋণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা শহীদের সব কিছু (পাপ) মাফ করে দিবেন।" (মুসলিম- ১৮৮৬)
- আরেক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, "এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হলো। তাকে আবার জিন্দা করা হলো, এবার সে আবারো শহীদ হলো। এই ব্যক্তিও জান্নাতে যেতে পারবে না, যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায়।"

সুতরাং আল্লাহর রাহের একজন মরদে মুজাহিদের জন্য সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো- ঋণ। কেননা একজন মুজাহিদ যদি তওবা করেন ও শাহাদাত লাভ করেন, তাহলে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, কোনো গুনাহের ব্যাপারে তার চিন্তার প্রয়োজন নেই, কেবল ঋণ ব্যতীত। আর বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে খুব অল্প সংখ্যক লোকই পাওয়া যাবে, যার লেনদেন ঠিক আছে। বিশেষ করে ধারকর্জ নেয়ার পর তা পরিশোধ করার ব্যাপারে। এই যামানার মুসলমান যে এরকম করবে তা তো আল্লাহ পাক জানতেনই। তাই কালামে পাকের সবচেয়ে বড় আয়াত ধারকর্জ এর নিয়ম নিয়ে নাজিল হয়েছে। সুতরাং ঋণ নিয়ে কিছু কথা-

১. ধারকর্জ আদান-প্রদান করার সময় অবশ্যই লিখিত রেকর্ড এবং দুইজন পুরুষ মুসলমান অথবা একজন পুরুষ মুসলমান ও দুই জন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে।

২. নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। অস্পষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েজ নেই। যেমন, এক সাথী ভাই তার একটি জমি বিক্রি করার চেষ্টা করছে। সে দোকান থেকে বাকিতে সদাই এই বলে নিতো যে, জমি বিক্রি করে শোধ করে দিবে। যেহেতু জমি কবে বিক্রি হবে জানা নাই, এক মাসের মধ্যেও হতে পারে বা এক বছরের মধ্যে নাও হতে পারে। তাই এভাবে বাকিতে সদাই খাওয়া জায়েজ নাই। কিংবা ধরা যাক, একজন চালের ব্যবসা করে। সে একজনের নিকট থেকে কিছু টাকা এই বলে ধার নিলো যে, এইবারের মালগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই আপনার টাকা দিয়ে দিব। যেহেতু মাল বিক্রি কত দিনে হবে জানা নাই, তাই এই ধরণের ঋণ জায়েজ নাই। অর্থাৎ যে কোনো রকম অস্পষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েজ নাই। আর যা কিছু শরীয়ত জায়েজ করেনি, তা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

৩. হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, "সদকা করার দ্বারা দশগুণ সওয়াব হয় এবং ঋণ দেওয়ার দ্বারা আঠার গুণ সওয়াব হয়।" এখানে আমাদের জানতে হবে ঋণ কখন দিবো বা নিবো। **ঋণ দেয়া ও নেয়ার সময় অবশ্যই যাচাই করতে হবে, যে প্রয়োজনটি আমার সামনে এসেছে তা পূরণ করা আমার জন্য ফরয বা ওয়াজিব কিনা।** যেমন অনেকে ধারকর্জ করে ওমরা করে। অথচ তাদের অবস্থা এরকম যে, তিনবেলা খানা ও বাড়িভাড়া যোগার করাটাই কষ্টকর। এদের জন্য ওমরা করা ওয়াজিব ছিলো না। তাই এদের জন্য ঋণ করে ওমরা করায় সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হওয়ার

সম্ভাবনা বেশি। কারণ বিশাল অংকের এই ঋণ শোধ করার সামর্থ্য এদের নাই এবং যারা ঋণ দিয়েছে তারা ঋণ পরিশোধের জন্য চাপাচাপি করবে।

মানুষ ব্যবসা করার জন্য ধারকর্জ করে। কিন্তু যেই ব্যবসা করার সামর্থ্য তার নাই, সেই ব্যবসা করার ইচ্ছা করাটাই লোভ। আর লোভকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন। তাই ঋণের টাকা দিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের ব্যবসাতে কখনো বরকত হয় না। আবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু কিছু মানুষ ধারকর্জ করে বাড়ি করে, গাড়ি কিনে, আরো কত কিছু না জানি করে। যেহেতু সাধ্যের বাইরের জিনিস অর্জন করা আমার জন্য ফরয বা ওয়াজিব নয়, বরং তা লোভ হিসেবে গণ্য, তাই এটা জায়েয নয়।

অনেকে প্রকৃতপক্ষেই অভাগ্রস্থ হয়ে ঋণ করে। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত মজদুরি করার মত শারীরিক শক্তি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার অনুমতি নাই। আর যদি সেই ক্ষমতাও না থাকে, হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, "কেউ যদি তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকে এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নিজের অভাবের কথা বর্ণনা না করে, তাহলে চতুর্থ দিন আল্লাহ পাক তার জন্য এক বছরের হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।"

ধারকর্জ করা কিছু মানুষের অভ্যাস। সামান্য সামান্য কারণে বা অকারণে মানুষ ধার করে ফেলে। এক সাথী ভাই দোকান থেকে পাঁচ লিটার সয়াবিন তেল নিলো বাকীতে। ১০ তারিখ বেতন পেয়ে টাকা দিয়ে দিবে। অথচ এই অবস্থায় তার উচিত ছিলো, আপাতত নগদ টাকায় হাফ লিটার তেল নিয়ে চলতে থাকা, তারপর বেতন পেলে প্রয়োজন মতো নিতে পারতো।

৪. আরো একটি জরুরী বিষয়, আমাদের দেশে মোটামুটি প্রায় সকলেই বিয়ের পর দেনমোহর আদায় করে না। এটাও স্ত্রীর নিকট ঋণগ্রস্ত থাকার মতো। বরং শরীয়তের হুকুম হলো স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই দেনমোহর দিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র নগদ টাকা বা স্বর্ণের অলঙ্কার দিয়ে মোহর দিতে হবে। মোহর দেয়া ওয়াজিব এবং স্ত্রী খুশি মনে তা ক্ষমা করে দিলেও ক্ষমা হয় না। তবে স্ত্রীকে মোহরের সম্পদ হস্তগত করার পর স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় স্বামীকে সেখান থেকে কিছু হাদিয়া দেয় তাহলে স্বামী তা ব্যবহার করতে পারবে।

৫. **যদি কেউ হঠাৎ কোনো বিপদে পরে যায় কিংবা তার ওয়াজিব দায়িত্ব পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে এবং সেই মুহূর্তে সে কিছু টাকার মুখাপেক্ষী হয়, কেবলমাত্র তখনই তাকে ঋণ দেওয়া চাই।** তাহলে ঋণদাতা আঠার গুণ নেকী পাবে। এরকম ক্ষেত্র ছাড়া কাউকে কখনো ঋণ দেওয়া যাবে না। যেমন এক ব্যক্তি ব্যবসার জন্য ঋণ চাইলো, কিংবা বিল্ডিং করার জন্য ঋণ চাইল, কিংবা ডিগ্রি করতে খরচ করার জন্য ঋণ চাইলো, কিংবা এ.সি কিনার জন্য ঋণ চাইলো ইত্যাদি- এসব ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া যাবে না। এমনকি মসজিদ-মাদরাসার বুনিয়াদী কাজ না হলে, বিল্ডিং করার জন্য কিংবা টাইল্‌স, এ.সি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য দান কিংবা ঋণ দেয়া যাবে না। এসকল ক্ষেত্রে দান বা ঋণ দিলে দুনিয়াপ্রীতির গুনাহে সাহায্য করা হলো বিধায় এ সকল ক্ষেত্রে দান না করা কিংবা ঋণ না দেয়া উচিত।

৬. আরেকটি জরুরী বিষয় হলো, কারো নিকট হতে ঋণ নেওয়া হলে তা নিজের নিকটে কোনো ডাইরিতে ঋণদাতার নাম, ঠিকানা , মোবাইল

নাম্বার ও ঋণের পরিমাণ লিখে রাখতে হবে এবং স্ত্রী, ছেলে, ভাই বা পিতাকে তা জানিয়ে রাখতে হবে। কারণ মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে। ঋণ আখিরাতে বড় পরিতাপের বিষয় হবে। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাযত করুন।

প্রসঙ্গঃ শরয়ী পর্দা

পর্দা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক আকীদা পোষণের পর নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি যেমন ফরয, তেমনি গাইর মাহ্‌রাম লোকদের সাথে পর্দা করাও ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ - ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয় । এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব-৫৯)

পর্দাহীনতা বা পর্দার বিষয়ে অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও কুরআনের নিষেধাজ্ঞার সরাসরি লঙ্ঘন, যা কবীরা গোনাহ্। বর্তমানে আমাদের সমাজ হতে পর্দা পুরোপুরি উঠে গেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের অবাধ মেলামেশা,

সহশিক্ষার কুফলে আজ বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ প্রেম-প্রীতি ও যিনা-ব্যভিচার, ইভটিজিং ইত্যদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে, দেশ ও জাতি মহাসঙ্কটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দীনদাররা এমনকি আলেমদের মাঝেও এখন পর্দা একটি সেকেলে প্রথা! তারা রাস্তাঘাটে চোখের হেফাযতের জন্য পেরেশান থাকে। কিন্তু ঠিকই ঘরে এসে ভাবী, শ্যালিকা, চাচী, মামীদের সামনে যাচ্ছে। যে পর্দা করে না সে গুনাহে কবীরা করনেওয়ালা, চোখের ও মনের যিনা করনেওয়ালা অর্থাৎ ফাসিক। "আমি পর্দা করি না", একথার অর্থ হলো "আমি ফাসেক দ্বীনদার, আমি ফাসেক তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালা, আমি ফাসেক হাফেয, আমি ফাসেক আলেম, আমি ফাসেক দাঈ, আমি ফাসেক মুজাহিদ, আমি ফাসেক ত্বলিবুল ইলম, আমি ফাসেক সালেকীন ইত্যাদি।" তাই পর্দার খুব এহতেমাম করা।

পর্দাহীনতা উম্মতের জন্য একটি বড় অভিশাপ। প্রত্যেক মুসলমানকেই এ থেকে বেঁচে চলতে হবে। নতুবা আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

❖ একজন পুরুষের জন্য যেসব ঘনিষ্ঠ মহিলা আত্মীয়ার সাথে পর্দা করা ফরয,তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :-

০১। চাচাত বোন	০৯। স্ত্রীর ভাতিজী
০২। ফুফাত বোন	১০। স্ত্রীর ভাগ্নি
০৩। মামাত বোন	১১। চাচী
০৪। খালাত বোন	১২। মামী
০৫। ভাবী	১৩। ভাতিজার স্ত্রী
০৬। ছোট ভাই বৌ	১৪। ভাগ্নের স্ত্রী
০৭। স্ত্রীর ভাই বৌ	১৫। স্ত্রীর ভাতিজা বৌ
০৮। স্ত্রীর বোন (শ্যালিকা)	১৬। স্ত্রীর ভাগ্নে বৌ

❖ পুরুষরা নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদেরকে বিয়ে করা হারাম।

১। আপন মা।

২। আপন দাদী, নানী ও তাদের বৈমাত্রেয় বোন।

৩। সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৪। আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত অধঃস্তন যে কোনো কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

৫। যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান ও স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও দাদী শাশুড়ী।

৬। ফুফু অর্থাৎ পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৭। খালা অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৮। ভাতিজী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের অধঃস্তন কন্যা।

৯। ভাগ্নী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে এবং তাদের অধঃস্তন কন্যা।

১০। দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে এবং তাদের অধঃস্তন মহিলারা।

১১। দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী এবং তাদের উর্ধ্বতন মহিলারা।

১২। দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত কন্যা সন্তান।

১৩। যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোনো প্রকার আর্কষণ নেই।

১৪। অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষদের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪নং বর্ণিত মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়িয আছে। উপরোক্ত মহিলারা ব্যতিত পুরুষের জন্য অন্য কোনো মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেই জায়িয নেই, বরং হারাম।

❖ একজন মহিলার উপর যেসব ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সাথে পর্দা করা ফরয, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

০১। চাচাত ভাই	০৯। ফুফা
০২। ফুফাত ভাই	১০। খালু
০৩। মামাত ভাই	১১। স্বামীর ভাতিজা
০৪। খালাত ভাই	১২। স্বামীর ভাগ্নে
০৫। দেবর (স্বামীর ছোট ভাই)	১৩। চাচা শ্বশুর
০৬। ভাসুর (স্বামীর বড় ভাই)	১৪। মামা শ্বশুর
০৭। নন্দাই (ননদের স্বামী)	১৫। ফুফা শ্বশুর
০৮। বোনের স্বামী	১৬। খালু শ্বশুর

❖ মহিলারা নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম।

০১। পিতা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষরা।

০২। সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

০৩। শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষরা।

০৪। আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।

০৫। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

০৬। ভাতিজা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন ছেলে।

০৭। ভাগিনা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোনো

ছেলে।

০৮। আপন চাচা অর্থাৎ বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

০৯। দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে।

১০। দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

১১। দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ।

১২। দুধ সম্পর্কীয় ভাই ও তার ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।

১৩। যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতিও মহিলাদের কোনো আকর্ষণ নেই।

১৪। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক, যার এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪নং বর্ণিত পুরুষদের বিয়ে জায়েয। মহিলার জন্য উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতিত অন্য কোনো পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেই জায়েয নেই, বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

সুতরাং মহিলাদের জন্য চাচাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাই, মামাত ভাই, দেবর, ভাশুর, খালু, ফুফা, চাচা শ্বশুর, উকিল বাপ, ধর্ম বাপ, ধর্ম ভাই, দুলাভাই, বেয়াই, ননদের জামাই প্রমুখের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা হারাম এবং তাদের সাথে বিয়ে-শাদী জায়েয।

একজন সাহাবীর তওবার গল্পঃ

তাবুকের যুদ্ধে নবীজী ﷺ-এর সাথে সায়ীদ বিন আব্দুর রহমান রদিয়াল্লহু আনহু জিহাদে গেলেন। আর তার বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব-ভার পরল আনসারী সাহাবী হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর উপর। হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু পর্দার আড়ালে থেকে নিয়মিত সায়ীদ রদিয়াল্লহু আনহুর বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ করে যেতেন। এদিকে শয়তান আস্তে আস্তে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর মনে কুমন্ত্রনা দিতে লাগল।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু একদিন পর্দা সরিয়ে সায়ীদ রদিয়াল্লহু আনহুর স্ত্রীর হাত স্পর্শ করে ফেললেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে সায়ীদ রদিয়াল্লহু আনহুর স্ত্রী তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'আপনার যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গিয়েছেন, আপনি কি তার আমানতে খিয়ানত করতে চান?' এ কথা শুনা মাত্রই হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর মনে অনুতাপের ঝড় সৃষ্টি হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করতে করতে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে গেলেন।

এদিকে জিহাদ শেষে নবীজী ﷺ ফিরে আসলেন। তখন মদীনার সবাই নিজ নিজ গাজী ভাইদের সংবর্ধনায় আসলো, কিন্তু হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুকে দেখা গেলো না। সায়ীদ রদিয়াল্লহু আনহু বাড়িতে এসে সবকিছু জানতে পেরে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুকে খুঁজতে লাগলেন। এক সময় তাকে পেয়ে বললেন, ভাই সা'লাবা! তুমি আমার সঙ্গে বড়দের দরবারে চল, দেখ তারা কি বলে। হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আমি এভাবে যাবো না। আপনি আমার হাতকে ঘাড়ের

সাথে বেঁধে গোলামের মতো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান, আমি তো অপরাধী। শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হলো। ওদের সাথে চললেন হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর কন্যা খামসানা রদিয়াল্লহু আনহাও, তার পিতা আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য।

প্রথমে তাকে নিয়ে গেল হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহুর কাছে। তিনি ঘটনা শুনে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুকে প্রহার করতে চাইলেন। হযরত সায়ীদ রদিয়াল্লহু আনহু তা করতে না দিয়ে নিয়ে গেলেন হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর দরবারে। তিনি বললেন, হে সা'লাবা! তোমার ব্যাপারে আমার কাছে কোনো ফয়সালা নেই। তুমি আমার দরবার থেকে চলে যাও। এরপর চলে গেলেন হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর নিকট। হযরত সায়ীদ রদিয়াল্লহু আনহুর কাছ থেকে তার ভাই হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর বর্ণনা শুনার পর বললেন, 'হে সায়ীদ! তোমার ভাইয়ের আল্লাহর দরবারে কি ফয়সালা আমি তা জানি না।' এ বলে তিনিও তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

অবশেষে গেলেন নবীজী ﷺ-এর মহান দরবারে। তিনিও বললেন, তোমার মত পাপীর কোনো উপায় নেই। অবশেষে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে আসলেন দরবার হতে। তাঁর এ অপরাধের কারণে কেউ কোনো পাত্তা দিলেন না। তখন কন্যা খামসানা তার পিতা হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার পিতা নন, যে পর্যন্ত না আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথীদের সন্তুষ্ট করতে না পারবেন। কোনো জবাব না দিয়ে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু পুনরায় পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন এবং পাগলের ন্যায় চিৎকার করতে লাগলেন।

আর বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমার কি কোনো ক্ষমা নেই? আমি আজ নিরাশ্রয়, নিরুপায়। কিন্তু হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমার মালিক, আমি আপনার গোলাম। আপনার মহান দরবারে এ গোলাম হাজির হয়েছে। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তবে আমার খুশির সীমা থাকবে না। আর যদি আপনি আমাকে নিরাশ করেন, তবে আমার ন্যায় হতভাগা আর কেউ নেই।" এই বলে আল্লাহর দরবারে অনবরত কাঁদতে লাগলেন আর গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকলেন। এভাবে সারারাত তিনি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, আর কাঁদতেন।

একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক জানতে চেয়েছেন, এ বিশ্বজাহান ও সমগ্র মানব জাতির রব কি আল্লাহ পাক নন?" (আল্লাহু আকবার!) রাসূলুল্লাহ বললেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সবকিছুর রব।" হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন, "আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আমি আমার গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করেছি।"

নবীজী ﷺ বললেন, কে আছো সা'লাবাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে? তৎক্ষণাত হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু ও হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু এবং তাঁদের পাশাপাশি হযরত আলী ও হযরত সালমান রদিয়াল্লহু আনহুমাগণ দন্ডায়মান হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তাঁরা সা'লাবাতুল আনসারীর অনুসন্ধান করতে করতে মদীনার উপকণ্ঠে এসে লোকদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা সবাই বলল, আপনারা কি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তির সন্ধান করছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন একজন

বলল যে, তিনি রাত্রে এখানে আসেন এবং এই গাছের নিচে উচ্চস্বরে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকেন। এ কথা শোনার পর হযরত আলী ও হযরত সালমান রদিয়াল্লহু আনহুমা নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথা সময়ে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর সাথে তাদের সাক্ষাত হলো।

হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু স্বস্থানে অঝোরে কাঁদছিলেন। তাঁরা হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুর কাছে এসে বললেন, হে সা'লাবা! চলুন! আল্লাহ পাক আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন। হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর নবীকে আপনারা কি অবস্থায় দেখে এসেছেন? তারা বললেন, আপনি যেমন আশা করেন তেমন অবস্থাতেই দেখে এসেছি। তিনি এখন আপনার উপর সন্তুষ্ট। তখন হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু তাঁদের সাথে নবীজী ﷺ-এর দরবারে রওয়ানা হলেন। হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুকে নিয়ে তাঁরা মসজিদে নববীতে হাজির হলে ফযরের জামাআত শুরু হয়ে যায়। তাঁরা সর্বশেষ কাতারে শরীক হন। নবীজী ﷺ-এর তিলাওয়াত শুনে হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

আর যখন সূরা তাকাসূরের দ্বিতীয় আয়াতটি পড়লেন, তখন হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহু বিকট এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। নামাযান্তে নবীজী ﷺ বললেন, তার মুখে পানির ছিটা দাও। তখন হযরত সালমান রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সা'লাবা ইন্তেকাল করেছেন। এমন সময় তার কন্যা খামসানা রদিয়াল্লহু আনহা পিতার মৃতদেহ দেখে কাঁদতে লাগলেন। তখন নবীজী ﷺ তাকে সান্তনা

দিয়ে বললেন, হে খামসানা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমার পিতা এবং ফাতেমা তোমার বোন? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট। তারপর হযরত সা'লাবা রদিয়াল্লহু আনহুকে দাফন করা হয়। দাফন এর সময় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ অংশ নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পায়ের উপর ভর করে হাঁটছিলেন। দাফন কার্যের পর হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু নবীজী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে আপনি সা'লাবার কবরের পার্শ্বে আপনার কদম মুবারক না রেখে আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটছিলেন? উত্তরে নবীজী ﷺ বললেন, হে উমর! সা'লাবার কবরে এত অধিক পরিমাণে ফেরেশতা জমা হয়েছিল যে, মাটিতে পা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সা'লাবার তাওবা এমনভাবে কবুল হয়েছিল যে, অসংখ্য ফেরেশতা তার জানাযাতে শরীক হওয়ার জন্য এসেছিল।

সুব্হানাল্লাহ!

তাই উম্মতের সকলের উচিত, খুব তাওবা করা। আল্লাহ পাক তো আমাদের রব। তিনি ক্ষমা করে দিবেন, তিনি তো বড়ই মেহেরবান।

দুনিয়ার মহব্বতের সাথে গুনাহের সম্পর্ক:

'দুনিয়ার মহব্বত' সকল গুনাহের মা, যার গর্ভে অন্য সকল গুনাহের ভ্রূণ প্রস্ফুটিত হয়। সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হচ্ছে 'দুনিয়াপ্রীতি'র সন্তান-সন্ততি। আজ উম্মতকে গুনাহ ছাড়তে বলা হয়, অথচ দুনিয়া ছাড়তে বলা হয় না। দুনিয়া ছাড়তে বলা হলেও সঠিক পথ বাতলানো হয় না। অথচ বর্তমানে উম্মতের সকল অনর্থের মূল এই 'দুনিয়া'। সুতরাং যে ব্যক্তি সকল গুনাহ থেকে একবারে পবিত্র হতে চায়, সে দুনিয়া ছাড়ুক। আর দুনিয়ার মহব্বত থেকেই অন্য সকল গুনাহের জন্ম, তাই দুনিয়ার মহব্বতই সবচেয়ে বড় গুনাহ।

গুনাহ করার পিছনে যে তাড়না কাজ করে তা হলো দুনিয়া লাভ করা বা দুনিয়া ভোগ করা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন একটি মন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যার আশা আকাঙ্ক্ষা অসীম। সে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সীমিত ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা কোনোভাবেই তৃপ্ত হতে পারবে না। একজন মানুষকে যদি পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-শান্তি, সম্পদ, ভোগ্য বস্তু প্রদান করা হয়, সে আরেক পৃথিবী কামনা করবে, আরেকটি দেয়া হলে আরেকটির বাসনা করবে, এভাবে কবরের মাটি ছাড়া তার পেট কোনোদিন ভরবে না। এজন্যই পৃথিবীতে সে যতই সম্পদ লাভ করুক, তার চাহিদা থাকে আরো লাভের, তার স্ত্রী যতই সুন্দরী হোক, সে কামনা করবে অন্যকে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, একজন মানুষ দশ দুনিয়ার সমান সাম্রাজ্য, ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত না হয়ে বা হূরের মতো সুন্দরী না পাওয়া পর্যন্ত তার কামনা-বাসনা কোনো দিন মিটবে না। তাই তো আল্লাহ তাআলা সর্বনিম্ন জান্নাতীর জন্যও দশ দুনিয়ার সমান জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ কারণে দুনিয়াতে

একজন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত রাখাই নফ্সকে নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে উত্তম উপায়। এক কথায় দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে বের করাই আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রথম, প্রধান ও মূল পদক্ষেপ।

লক্ষ্য করুন! এক ব্যক্তি হয়ত চুরি করল বা জিনা করলো, সে একটি কবীরা গুনাহ করলো। গুনাহটি সাময়িক এবং তাওবা করলে সে নাজাত পেয়ে যাবে। কিন্তু এক ব্যক্তি দীলের মাঝে দুনিয়ার মহব্বত লালন করে। ফলে সে ভবিষ্যতে সুখী হবে চিন্তা করে গাড়ি, বাড়ি, সুন্দরী রমনীর আশা করে। একটু চিন্তা করে বলুন তো, তার এই দীর্ঘ আশাকে কি আপনার কাছে কোনো গুনাহ মনে হচ্ছে? ব্যাপারটি আমাদের নিকট অনেক হালকা, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের নিকট এই দীর্ঘ আশাটি ছিল ভয়াবহ গুনাহ, মুসলমানদের জন্য যদি কবীরা গুনাহের উপর আরো কোন গুনাহ থাকতো সেটি হতো এটি। কেন? কারণ এই ব্যক্তি বাহ্যত কোনো গোনাহ করেনি, কিন্তু খেয়াল করে দেখুন এই লোকটি এখন তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কি করবে? বাড়ি, গাড়ি, অভিজাত-সুন্দরী নারীর জন্য প্রয়োজন উত্তম সামাজিক অবস্থান, আর সামাজিক অবস্থান তৈরির জন্য লাগবে পদ-পদবী-দুনিয়াবী ডিগ্রি, অর্থ সম্পদ। আর তখন এগুলোর লোভ তার দীলে ভর করবে। আবার এগুলো হাসিলের জন্য তাকে চাকুরী করতে হবে, চাকুরীর জন্য দুনিয়াবী পড়াশুনা করতে হবে, দুনিয়াবী পড়াশুনা করার জন্য তাকে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়তে হবে, আর সেখানে পড়তে গেলে তাকে বেপর্দা, গান-বাজনা, নারীর ফেতনায় পড়তে হবে, হয়তো সে প্রেমে পড়বে, নয়তো অশ্লীল মুভ্যি দেখবে। বেশি বেশি পড়াশুনার জন্য শরীর ঠিক রাখতে হবে চিন্তা করে তিন বেলা পেট ভরে খাবে, ফলে কামোত্তেজনায় ভুগবে, ফলে তেলের মধ্যে ঘি ঢালার ন্যায় অবস্থা সৃষ্টি

হবে। ফলে সে গুনাহে লিপ্ত হবে। এভাবে যখন তার যিন্দেগী শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে, তখন সে দেখবে, হয়তো তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে কিংবা হয়নি। কিন্তু যা হয়েছে, তা হলো তার দীর্ঘ আশার ফলে তার সমগ্র যিন্দেগী বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আখিরাতের জন্য সে কিছুই পাঠায়নি। বিরানভূমিতে সে যেতে চাবে কেন? তাই আরেক বিপদ 'মৃত্যুর ভয়' পেয়ে বসবে। যে ব্যক্তি দুনিয়া ছাড়ার মশক করেনি, যে ব্যক্তি ঈমানী মেহনত করেনি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পায়, সে কি জিহাদ করতে পারবে? দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়ে এ ব্যক্তি জিহাদ ত্যাগ করে 'কাপুরুষের' যিন্দেগী যাপন করবে। আর এভাবেই আজ প্রতিটি মুসলমান 'দুনিয়াদারীর দুষ্টচক্রে' আবদ্ধ হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আর আখিরাত বরবাদ করছে? আর আযাব স্বরূপ আল্লাহ তাআলা বিজাতীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। তারা একে অপরকে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য এমনভাবে ডাকছে, যেভাবে আমরা দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়ার জন্য একে অপরকে ডেকে থাকি।

চিত্র: দুনিয়াদারীর দুষ্টচক্র।

কি দীনদার, কি দুনিয়াদার, কি জাহেল, কি মাদরাসার আলেম, আমরা সকলেই এই দুষ্টচক্রের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি। কিন্তু সাহাবাওয়ালা ইসলাম এই চক্রের ভিতরে নয়, বাহিরে! যদিও অনেকেরই মেনে নিতে কষ্ট হবে, কিন্তু এটাই চিরসত্য!

দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগই সকল গুনাহ হতে মুক্তির একমাত্র উপায়ঃ

আচ্ছা! যে ব্যক্তি কম পানাহার করে, হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য থেকে পরহেয করে, একদিন/দুইদিন/তিনদিন পর পর আহার করে, তার কামরিপু কি তাকে সুরসুরি দিবে? আর যার কামরিপুর তাড়না নিয়ন্ত্রনে থাকে, তার দৃষ্টি কি রাস্তাঘাটে মেয়েদের উপর পড়বে?

যে ব্যক্তি দুনিয়ার আশা ত্যাগ করেছে, আখিরাতে জান্নাতের হূর আশা করে, সে কি অশ্লীল মুভ্যি, পর্নোগ্রাফী ইত্যাদি দেখবে?

কম পানাহারের দরুন যার নফস দুর্বল হয়ে যাবে, তার জিহ্বা কি অধিক সঞ্চালিত হবে, সে কি বেহুদা কথা বলবে?

যে ব্যক্তি দুনিয়া আশা করে না আর আশা করে যে, আখিরাতে জান্নাতে উচ্চ সিংহাসনে বসে জান্নাতের সঙ্গীত শুনবে, সে কি খেলাধুলা করে বা দেখে সময় নষ্ট করবে, সে কি দুনিয়ার গান-বাজনা শুনবে?

যে ব্যক্তি দুনিয়ার কথা ভুলে গেছে, আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয় রাখে, সে কি নিজের স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের হক (অধিকার) নষ্ট করবে? তাদেরকে কষ্ট দিবে, তাদের সাথে মন্দ আচরণ করবে? সে কি পিতা-মাতার অবাধ্য হবে? সে কি বোনের ওয়ারিশ ঠকাবে?

যে ব্যক্তি স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের মহব্বতকে কুরবানী করতে পেরেছে, সে কি জিহাদ ত্যাগের মতো ভয়াবহ গুনাহ করতে পারে?

যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিলাসিতা ত্যাগ করেছে, বাড়ি-গাড়ি করার চিন্তা বাদ দিয়েছে, সে কি অধিক ধন সম্পদের লোভ করবে? যারা অধিক আহার করা, অধিক পরিধান করা বাদ দিয়েছে, তাদের মাস পার করতে কি খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন আছে?

আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অধিক ধন-সম্পদের লোভ ত্যাগ করেছে, সে কি মাল জমাবে, অধিক মাল কামানোর জন্য দুই হাতে আয় রোজগার করবে? হারাম খাবে? সে কি সরকারী চাকুরী, কিংবা দুনিয়াবী ডিগ্রির ধান্দা করবে? এগুলোর পিছনে পড়ে অনন্তকালের আখিরাতকে বরবাদ করবে? 'দুনিয়া চলে' এবং 'অন্যের দুয়ারে হাত না পাতা লাগে' পরিমাণ অর্থ-সম্পদে কি সে সন্তুষ্ট থাকবে না?

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অল্পে তুষ্ট থাকে, সে কি বাড়ি-গাড়ি করার জন্য, বড় ব্যবসা করার ধান্দায় সুদের উপর কোটি কোটি টাকার ব্যাংকলোন নিবে?

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বড় বড় চাকুরী, প্রভাব-প্রতিপত্তি আশা করে না, তার মাঝে পদবীর লোভ, ক্ষমতার লোভ কিভাবে আসবে?

যে ব্যক্তি দুনিয়ার হাকীকত জানে এবং একথাও জানে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ-পদবী, এগুলো ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে কিছুদিনের জন্য দান করেন আর আখিরাতের অর্জন চিরস্থায়ী, সে কিভাবে অন্যের দুনিয়াবী উন্নতি দেখলে হিংসা, ঈর্ষা করতে পারে? যে নিজের আখিরাত নিয়েই ব্যস্ত, তার চোখে কি অন্যের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়বে? তাহলে সে কিভাবে অন্যের গীবত করবে?

যে ব্যক্তি অল্প দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট, আর যখন সে কম খাবে, কম পরবে, ছেঁড়া মলিন তালি দেয়া পোশাক পরিধান করবে, নিজেকে অন্যের চেয়ে নিম্নমানের দেখবে, নিজের সামাজিক অবস্থান সমসাময়িকদের চেয়ে নিচে দেখবে, লোকে তাকে অসামাজিক বলবে, তখন সে নিজেকে ছোট মনে করতে থাকবে, আচ্ছা! এই ব্যক্তির হৃদয়ে কি অহংকার (তাকাব্বুর তথা নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা), আত্মশ্লাগা (উযুব বা খোদপছন্দী, নিজেরটা নিজের ভালো লাগা) ইত্যাদি ব্যাধিগুলো বাসা বাঁধবে?

যে ব্যক্তি মনে করে যে, 'আমি দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম আহকামগুলো সেভাবে মানতে পারছি না, যেভাবে মানলে আল্লাহ পাক খুশি হবেন, আল্লাহর ক্রোধ আমার উপর আসবে না; হায়! আমি কতই না আল্লাহর হক নষ্ট করছি', তাহলে সে ব্যক্তি কিভাবে অন্যের উপর ক্রোধান্বিত হবে? তাছাড়া খালি পেটে ক্ষুধার কষ্ট থাকলে ক্রোধকে দমন করা কত সহজ হয়ে যায়!

আর যে ব্যক্তি আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করলো, আরাম আয়েশ, বিলাসিতা, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, পদ-পদবী, সবকিছু, সে কি ইবাদত করার সময় লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে ইবাদত করবে? এই পর্যায়ে এসে সে কি এমন বোকার পরিচয় দিবে? বরং সে সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, তার এই কুরবানী আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয় কিনা, তার নাম মুনাফেকদের তালিকায় উঠে গেল কিনা? তাহলে কিভাবে সে রিয়া করবে?

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আমাদের যিন্দেগীর প্রতিটি নাফরমানীর পিছনে কোনো না কোনো ভাবে দুনিয়া জড়িত।

দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগই সকল প্রশংসনীয় গুণ অর্জনের একমাত্র উপায়ঃ

যে ব্যক্তি কম পানাহার করে, তার মধ্যে ধীরতা, স্থিরতা, নিরহংকারপূর্ণ গাম্ভীর্য উৎপন্ন হয়। কম ঘুম, কম কথা বলা ও কম মিলামিশার অভ্যাস গড়ে উঠে। দীলের মাঝে প্রফুল্লতা ও তীক্ষ্ণতা তৈরি হয়। তিলাওয়াত, নামায, যিকির ও দুআয় অপরিসীম স্বাদ ও মজা অনুভূত হয়। ফলে সে ইবাদতের মিষ্টতা অনুভব করে। ফলে তার দীল গাইরুল্লাহ মুক্ত হতে থাকবে।

যে নিজের চোখকে নিয়ন্ত্রন করতে পারলো, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে।

যে দুনিয়া ত্যাগ করতে পারলো, দুনিয়ার অর্থ সম্পদের মোহ ত্যাগ করতে পারলো, তার মাঝে অল্পে তুষ্টি, তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি, সবর ও শোকর পয়দা হবে।

যে দুনিয়ার দীর্ঘ আশা ত্যাগ করতে পারবে, স্ত্রী-সন্তান-পিতা-মাতার মহব্বতকে কুরবানী করতে তৈরি হবে, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তার মাঝে মৃত্যুর স্মরণ, আখিরাতের স্মরণ পয়দা হবে, ইখলাছ পয়দা হবে, জিহাদ করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে, বীরের যিন্দেগী লাভ করবে।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকে নিকটে জানবে, সে কি ওযু ছাড়া থাকতে পারবে? সে তো চিন্তা করবে, এখন যদি আমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে তো

আমাকে নাপাক অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে হাযির হতে হবে। তাই ওযু ভাঙার সাথে সাথে সে আবার ওযু করে নিবে।

দুনিয়ার সকল আসবাবের হাকীকত যখন তার সামনে স্পষ্ট হবে, তখন সে দুনিয়ার কোনো কিছুর উপর নির্ভর করবে না, কোন মাখলূখের উপর ভরসা করবে না, তার মাঝে কেবলই আল্লাহ তাআলার শক্তি, সামর্থ্যের উপর আস্থা তৈরি হবে, তাওয়াক্কুলের সিফত পয়দা হবে।

আর সে যখন দুনিয়ার সকল মাখলূখ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখন সে আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভ করবে, যেমনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ পাক তোমাকে মহব্বত করবেন। মানুষের নিকটে যা কিছু আছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, মানুষ তোমাকে মহব্বত করবে।" আল্লাহ তাআলা তাকে মহব্বত করার ফলে ব্যক্তির অন্তরেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ মহব্বত পয়দা হবে, সে তখন আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর পথে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে। কেননা মাশুকের সাথে মিলিত হওয়ার শর্টকাট রাস্তা তখন একটিই থাকবে, আর তা হলো শাহাদাত।

গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য করণীয় কয়েকটি কাজঃ

১. হিম্মত করা (গুনাহ ত্যাগের জন্য সাহস করে সংকল্প করা)।

২. গুনাহের উপকরণ ত্যাগ করা (মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)।

৩. হুসনে মহল (গুনাহের পরিবেশ থেকে পলায়ন করে সুন্দর দীনদারীর পরিবেশে গমন করা)

৪. দুনিয়া ত্যাগ (দুনিয়ার দীর্ঘ আশা ত্যাগ করে দুনিয়াকে গুটিয়ে নেয়া।)

৫. জীবনের জন্য একজন যোগ্য রাহবার ঠিক করা (গুনাহ ছাড়ার ব্যাপারে যিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিবেন)।

ষষ্ঠ গুণ

বিশেষ কয়েকটি আমলের বেশি বেশি এহতেমাম করা

০৬. বিশেষ কয়েকটি আমলের বেশি বেশি এহতেমাম করা

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের প্রধান হাতিয়ার হবে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক ও দুআ:

আল্লাহ পাক প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে তার দীনকে প্রবেশ করাবেন, যেমন কিনা এখন প্রত্যেক কাঁচাপাকা ঘরে বদদ্বীনী প্রবেশ করেছে। আর এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং তার সাথে কাজ করবে পবিত্র মানুষদের একটি জামাত, যাদের যিন্দেগী হবে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবাদের যিন্দেগীর মতো অত্যন্ত সাদামাটা, দুনিয়ামুক্ত যিন্দেগী। একজন সাধারণ মানুষ, যার সম্বল মাত্র দুটি জুব্বা, তিনি লড়াই করবেন আমেরিকা, ইসরাঈল, ব্রিটেন, সিরিয়া, কোরিয়া, ইরান, চীন ও রাশিয়ার মত বিশাল এক দাজ্জালি শক্তির বিরুদ্ধে, আর উনার প্রথম দিনে সঙ্গী হবে কেবল ৩১৩ জন। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে প্রথম দিন বাইয়াত হওয়া মানুষের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ হলো, উম্মত বুঝতেই পারবে না যে ইমাম মাহদী এত দ্রুত আগমন করবেন; আরেকটি কারণ হলো, উম্মতের উলামায়ে কেরামগণ, ওলী-আউলিয়াগণ, সাধারণ দ্বীনদারগণ, সালেকীনগণ, দাঈগণ, এমনকি মুজাহিদগণও এ ব্যাপারে বেখবর থাকবেন যে, এ বছরই ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন। খবর পেলেও ব্যাপারটিকে তারা তেমন পাত্তা দিবেন না, যার ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে পরম সৌভাগ্যশীল ৩১৩ জনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত

করে দিবেন; এটাই আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। আর এই সৌভাগ্য অর্জন করবেন মৃত্যুকে মহব্বতকারী অল্প কিছু লোক, যাদেরকে আল্লাহ পাক চাইবেন, যাদের যিন্দেগী সাহাবায়ে কেরামের মতো, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পথ দেখাবেন, নিদর্শন দেখাবেন, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের পরম সৌভাগ্যশীল সাথী বানাবেন।

প্রথম দিন যারা বাইয়াত হবেন, তাদের না থাকবে কোনো অস্ত্র, না থাকবে যুদ্ধের জন্য তেমন সামরিক ট্রেনিং বা অর্থবল; তারা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে যুদ্ধ করবে, যেমন কিনা বদরের যুদ্ধে সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুমদের অবস্থা ছিলো। তাদের সাথে অস্ত্র বলতে তেমন কিছুই ছিলো না, আবার তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। অপরদিকে কাফেররা ছিলো যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত এবং অস্ত্রে সজ্জিত।

আল্লাহ পাক বিজয় দানের জন্য অস্ত্রের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ পাক জমিনে খেলাফত দান করার জন্য অস্ত্রকে শর্ত রাখেননি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَرْضِ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সাথে সাথে নেক আমল করবে তাদের জন্য আল্লাহ পাকের ওয়াদা হলো তিনি তাদেরকে জমিনের খেলাফত দান করবেন।” (২৪ সূরা নূর: ৫৫)

হযরত আবুদ্দারদা রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, “যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে নেক আমল কর, কেননা তোমরা কেবল তোমাদের আমলসমূহের মাধ্যমেই লড়াই করে থাক।” (কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৮৩)

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ ঈমান ও নেক আমলের উপর দৃঢ় ছিলেন। ফলে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার গাঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, ফরয আমলের দ্বারাই বান্দা আমার সর্বাধিক সান্নিধ্যে উপনীত হয়। আর নফল আমলের দ্বারা বান্দা আমার আরও নিকটবর্তী হয়; তখন আমি তাকে ভালোবাসি। ফলে আমিই হই তার শ্রবণশক্তি, যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমিই হই তার দৃষ্টিশক্তি যদ্বারা সে দেখে, আমিই হই তার রসনা, যদ্বারা সে কথা বলে, আমিই হই তার হাত, যদ্বারা সে ধরে, তার পা যা দিয়ে সে চলে।" (বুখারী, মুসলিম)

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিন্দেগীকে অক্ষরে অক্ষরে, কদমে কদমে অনুসরণ করতেন। তাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের জন্য মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ পাক তাঁদের পক্ষে ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَه‘

"যে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আল্লাহ পাক তার জন্য হয়ে যান।"

আর যদি আল্লাহ পাক কারো জন্য হয়ে যান, তাহলে আর কে আছে তাকে পরাজিত করতে পারে।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ
وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

"যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৬০)

তাই শক্তি অস্ত্র ও লোকবলের দ্বারা সৃষ্টি হয় না, শক্তির মূল উৎস আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্য।

বর্তমান যামানায়ও যারা সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, দুনিয়াকে পরিপূর্ণরূপে ছাড়বে, আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করবে না, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসিকতা লালন করবে, আমলী যিন্দেগী গড়ে তুলবে, তাদেরকেই আল্লাহ পাক ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হিসেবে বাছাই করবেন, তাদের দ্বারা দুনিয়ার সকল বাতিলকে মিটাবেন, তাদের হাতেই আল্লাহ তাআলা বিশ্বব্যাপী খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দিবেন।

তাই, আমাদের উচিত নফল আমলগুলোর যথাসাধ্য এহতেমাম করা। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, 'আমল' হচ্ছে 'ঈমানী শক্তি' হেফাযতের জন্য দেয়ালস্বরূপ।

একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং পরবর্তীদের মাঝে এমন অনেক বুযুর্গ পাওয়া যায়, যারা সারারাত ইবাদত করতেন, চল্লিশ বছর ঈশার অযু দিয়ে ফযরের নামায পড়েছেন, আজীবন প্রতি রাতে এক খতম দিতেন, এমনও পাওয়া যায়, একদিনে আঠার খতম দিয়েছেন, আবার সারা বছরই নফল রোযা রাখতেন ইত্যাদি। অবশ্যই তাঁরা আল্লাহ পাকের মকবুল, সালেহীন বান্দা সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা

হলো, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তো এতো বেশি পরিমাণ আমলের ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কেরামও অনেক আমল করতেন, ঠিক আছে, কিন্তু তাঁরা এসকল আমলের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত, দুনিয়াত্যাগ, আখিরাতের স্মরণ আর দাওয়াত ও জিহাদকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। এগুলোকে যিন্দেগীর মাকসাদ মনে করতেন। এককথায় যেই আমলগুলো ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়, নবীওয়ালা যিন্দেগীর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেই আমলগুলো ফরয, যে আমলগুলোতে বেশি লাভ, বেশি ফাযায়েল, সে আমলগুলোকে তাঁরা আগে প্রাধান্য দিতেন। তাই বলে তাঁরা নফল আমলগুলোকে কম গুরুত্ব দেননি। কেননা এসকল আমলের দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে নূর পয়দা হয়, আরো উন্নতি সাধিত হয়, মনোবল ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ সহজ হয়ে যায়। তাই সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে গুরুত্বের সাথে নীচের প্রতিটি আমল করেছেন, আমাদেরও উচিত সেভাবে তাঁদের অনুসরণ করে যথাসাধ্য আমল করতে থাকা।

বিশেষ কয়েকটি আমলের বেশি বেশি এহতেমাম করা, যথা-

ক. সাহাবাওয়ালা নামায বানানো
খ. নিয়মিত তিলাওয়াত করা
গ. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির করা
ঘ. বেশি বেশি দরূদ শরিফ পড়া
ঙ. বেশি বেশি দুআর এহতেমাম করা
চ. নবীজী ﷺ-কে কদম ব-কদম অনুসরণ করা এবং
ছ. আমলের নিয়তে উপকারী এলমে দ্বীন আগে হাসিল করা

ক. সাহাবাওয়ালা নামায বানানো

ওহে মুসলিম! জেনে নাও-

ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে নামায।

নামায তো ঐ ইবাদত, যাতে আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি মী'রাজ (সাক্ষাত) লাভ হয়।

তুমি এমনভাবে নামায আদায় করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, তা যদি না পার তবে এতটুকু যেন স্মরণে অবশ্যই থাকে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

যখনই তুমি চাও আল্লাহর সাথে কথা বলতে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। আর যদি তুমি চাও আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলুন, তাহলে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করো।

নামায তো ঐ ইবাদত, যাতে রয়েছে চোখের শীতলতা ও প্রশান্তি।

নামায তো ঐ ইবাদত, যা তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখবে।

নামায তো ঐ ইবাদত, যা তোমার কবরের নূর, পরকালের নাজাত।

নামায তো ঐ ইবাদত, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতী ভান্ডার থেকে খুব সহজেই, যে কোনো সময়, যে কোনো কিছু আদায় করে নেয়া যায়।

নামায তো ঐ ইবাদত, যার শক্তিতে সাহাবায়ে কেরাম সমুদ্রের উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

নামায তো ঐ ইবাদত, যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম তো এমন ছিলেন,

নিয়ামত পেয়েছেন?- নামায!
কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়েছে?- নামায!
জুতার ফিতা ছিড়ে গিয়েছে?- নামায!
ঘরে খানা নেই?- নামায!
কি করবেন বুঝতেছেন না?- নামায!
ভুল-ত্রুটি হয়েছে?- নামায!
বিপদে পড়েছেন?- নামায!
সন্তান মারা গিয়েছে?- নামায!
চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ হচ্ছে?- নামায!
জিহাদের ময়দানে?- নামায!
আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন?- নামায!
সকাল হয়েছে?- নামায!
নাস্তার সময় হয়েছে?- নামায!
দুপুর হয়েছে?- নামায!
বিকাল হয়েছে?- নামায!
সন্ধ্যা হয়েছে?- নামায!
রাত্রি হয়েছে?- নামায!
সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?- নামায!
গভীর রাতে?- নামায!

সফরে বের হবেন?- নামায!

সফর হতে ফিরে এসেছেন?- নামায!

আল্লাহর রাসূলের জীবনের শেষ কথা ছিলো-

নামায! নামায! নামায!

আল্লাহ তাআলাও ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথে যারা আছে তাঁরা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তুমি যখনই তাদের দেখবে, তাদেরকে রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় দেখবে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করছে, তাদের চেহারায়ও সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।" (৪৮ সূরা ফাত্হ: ২৯)

এ থেকেই বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম নামাযের কতটা পাবন্দী করতেন এবং কতটা গুরুত্ব দিতেন। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য, আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য একজন মুমিনের জীবনে নামাযের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো আমল নেই! কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম সমাজ থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিস বিদায় নিয়েছে তা হলো, সর্বপ্রথম ইসলামের যে নিয়ামতকে তুলে নেয়া হয়েছে তাহলো- নামাযের

খুশু-খুযু (বিনয়-নম্রতা তথা নবীওয়ালা নামায)। বর্তমানে মসজিদ ভরা মুসুল্লী, কিন্তু একজন মানুষের নামায দেখেও মনে হবে না, এই লোকটির নামাযের মধ্যে খুশু-খুযু ও ধ্যান-মগ্নতা আছে। ছোট সময় পিতা-মাতা যেভাবে নামায আদায় করা শিখিয়েছিলেন, কিংবা মক্তবে শিখেছিলাম, বেশি থেকে বেশি, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে গিয়ে কিংবা মাদরাসার কোনো আলেমের কাছ থেকে কিছু মাসআলা মাসাইল শিখে, আজীবন সেভাবেই নামায আদায় করছি। নবীওয়ালা নামায তো শুধু মাসলা-মাসাইলের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আজ মুসলমান আত্মিক দুর্বলতায় ভুগছে, গুনাহ ছাড়ার হিম্মত হয় না, নাফরমানী ছাড়তে পারে না, অথচ উম্মত নামায আদায় করছে! তাই আমাদেরকে নবীওয়ালা নামায কাকে বলে তা জানতে হবে, এবং আজীবন মশক করে করে, মেহনত করে করে সেভাবে নামায আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

֍ নামাযের জন্য সাহাবায়ে কেরামের পূর্বপ্রস্তুতি:

১. অধিকাংশ সাহাবী আযানের আগেই নামাযের জন্য মসজিদে চলে আসতেন। হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু সবার আগে মসজিদে আসতেন, সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হতেন।

২. যারা আযানের আগে আসতে পারতেন না, আযান শুনা মাত্রই দুনিয়ার কাজকর্ম ফেলে মসজিদে ছুটে আসতেন। কেউ কাঠ কাটার জন্য কুঠার উত্তোলন করেছেন, আযান শুনা মাত্রই কুঠার মাথার উপর থেকে পিছন দিকে ফেলে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম নামাযের ব্যাপারে এতটা সতর্ক ছিলেন।

৩. আযান শুনা মাত্রই তাদের চেহারা (আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে) বিবর্ণ হয়ে যেত, যেন তাঁরা নিকটজনকেও চিনতে পারতেন না।

৪. তারা কেউ কখনো মাসবূক হতেন না। কেউ একবার মাসবূক হলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তাকে তিরস্কার করা হতো।

সাহাবায়ে কেরামের নামাযের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. খুব ধীর-স্থির ভাবে নামায আদায় করতেন।

২. নামাযে কোনোরূপ নড়া-চড়া পরিলক্ষিত হতো না, ফলে পাখি পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মাথায় এবং রুকু সেজদার সময় পিঠে বসে পড়ত।

৩. অনেক সময় কান্নার কারণে চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরত। ফলে তাঁদের দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত।

৪. তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ সূরা, দীর্ঘ রুকু-সিজদা করতেন। কখনো কখনো অর্থের দিকে খেয়াল করে একটি আয়াতই বারবার পড়তেন, এমনকি সকাল হয়ে যেত।

৫. প্রিয়নবী ﷺ এত দীর্ঘ নামায আদায় করতেন যে, তার পা মোবারক ফুলে যেত।

সাহাবায়ে কেরামের নামাযের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যঃ

১. তাঁরা এমনভাবে নামায আদায় করতেন যেন আল্লাহ তাআলাকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন।

২. কখনো কখনো নামাযের মাঝে কোনো একটি আয়াত শুনে, এমন (ভয়ের) হালত তৈরী হতো যে, চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন, কেউ কেউ এভাবে মৃত্যুবরণও করেছেন।

৩.নামাযে তাঁদের এমন হালতও পয়দা হতো যে, তাঁরা পৃথিবীর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন, ফলে তাঁরা নামাযরত অবস্থায় কোনো শব্দ শুনতে পেতেন না, কোনো ব্যথার অনুভূতি থাকতো না, ফলে শরীর থেকে বিদ্ধ তীর খুলে ফেললেও তারা একটুও টের পেতেন না। এককথায় দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যেত।

ꕥ নামাযে সাহাবাওয়ালা খুশু খুযু তৈরির উপায়ঃ

এটি একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। এক দুই দিনের মেহনতে অর্জন হবে না। তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে মেহনত করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে নামাযের মাঝে রূহ পয়দা হবে, নামাযের মাঝে চক্ষুর শীতলতা ও প্রশান্তি চলে আসবে। আরো মেহনত করতে থাকলে একসময় বাকী হালতগুলোও আল্লাহ তাআলা চাইলে পয়দা হবে। তাই সাহাবাওয়ালা নামায বানানোর জন্য আজীবন চেষ্টা করার একটি দৃঢ় প্রতীজ্ঞা করতে হবে। নামাযকে সুন্দর করার মেহনত করতে শুরু করলে, দুয়েক দিনের মাঝেই অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা শুরু করবে, যার ফলে সামনে আগে বাড়া অনেক সহজ হবে। তাই নিম্নে যেভাবে পথ বাতলানো হলো, সেভাবে মেহনত করতে থাক। ইনশাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই নামায তোমার জন্য চক্ষুর শীতলাতা দানকারী হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা নামায দান করুন। আমীন।

এই মেহনত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করতে হবে। যথা:

- **ধাপ-১: মাসআলা মাসাইল ও সহীহভাবে কুরআন শিক্ষা:**

এই ধাপে কোনো একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের কাছ থেকে পবিত্রতা হাছিলের জ্ঞান (ইস্তিঞ্জার আদব, গোসল, ওযুর মাসাইল) এবং নামাযের সকল মাসাইল শিখে নিতে হবে। নামাযের মাঝে ক্বিরাত পড়া যেহেতু ফরয, সেহেতু কুরআন কারীম শুদ্ধ করাও স্বতন্ত্র একটি ফরয কাজ। তাই একজন ভালো আলেমে দ্বীনের কাছ থেকে কুরআন কারীম শুদ্ধ করে তিলাওয়াত শিখতে হবে।

- **ধাপ-২: চোখকে স্থির রাখা**

দ্বিতীয় ধাপে চোখের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেন চোখ এদিক সেদিক না তাকায় এবং বন্ধও না থাকে। দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে, রুকুতে দুই পায়ের মাঝে, সিজদার সময় দুই হাতের আঙুলের মাঝে এবং বসা অবস্থায় দুই উরুর দিকে দৃষ্টিকে স্থির রাখতে হবে। একটুও দৃষ্টিকে নড়াচড়া না করানো।

জামাতের নামায আদায় করার সময় কানকেও স্থির করা। অর্থাৎ ইমাম সাহেব কী তিলাওয়াত করছেন, তা স্থির কানে শুনা।

- **ধাপ-৩: স্থির অবয়বের নামায তৈরির মেহনত:**

এ ধাপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে স্থির করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, নামাযের মাঝে এমন স্থির হওয়া যেন দেখে মনে হয় একটি কাঠের খুঁটি মাটিতে পুঁতে রাখা আছে। কোনো নড়া-চড়া করা যাবে না।

• ধাপ-৪: ধীর গতি সম্পন্ন নামায তৈরির মেহনত:

এই ধাপে আপনাকে 'সময়ের' দিকে মনোযোগী হতে হবে। ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়লেও কিংবা রুকু-সিজদার তাসবীহ তিনবার করে পড়লেও দুই রাকাত নামায আদায় করতে যেন দশ মিনিট সময়ের কম না লাগে এবং চার রাকাতের জন্য বিশ মিনিট সময় লাগে। এটি সর্বনিম্ন সীমা। এরচেয়ে ধীর গতিতে পড়তে পারলে আরো ভালো। ভালো করে বুঝে নিন, সময় বাড়ানোর জন্য তাসবীহের সংখ্যা, কিংবা কিরাতের পরিমাণ বাড়ানো উদ্দেশ্য নয়। বরং আপনি এখন যেই পরিমাণ তাসবীহ বা কিরাত দিয়ে আড়াই মিনিটে দুই রাকাত নামায আদায় করেন, এই নামাযটাকেই ধীর করে দশ মিনিটে নিয়ে যাবেন। একই রকমভাবে যা যা পড়ে চার রাকাত নামায আপনি পাঁচ-ছয় মিনিটে পড়তেন, তাকে এখন বিশ মিনিটে পড়ার চেষ্টা করবেন। তাহলে দেখবেন ধ্যানের উপর নিজের নিয়ন্ত্রন চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এভাবে সময়ের দিকে খেয়াল রেখে নামাযের ধীরতা আনতে হবে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে-

✓ এটি তখনই সম্ভব হবে এবং আমার জন্য কোনো কষ্ট হবে না, যখন আমি মনে করব, আমি এখন যে কাজটি করছি এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাজ। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা আমি তো এখন দাঁড়িয়ে আছি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার সামনে।

✓ নামায যেন এমন হয়, নামায শেষ করার কোনোরূপ তাড়া নেই। যেন এই নামায যে শুরু হলো কোনো দিন আর শেষ হবেনা। আমি

আল্লাহর কাছে চলে এসেছি, আর ফিরে যাবো না। এভাবে "নামায শেষ করে দুনিয়াবী বা অন্য কোনো দ্বীনী ব্যস্ততায়/ইবাদতে লিপ্ত হব"-এই ধরণের পেরেশানী থেকে দীলকে মুক্ত করতে হবে। সবসময় মনে করতে হবে, নামাযই সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাযের পর শত কাজ থাকলেও আমার নামায একই রকমভাবে শেষ হবে। কাজের কারণে নামাযের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

✓ সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা তিলাওয়াত অত্যন্ত ধীর-গতিতে করব। কিন্তু সূরার শব্দের মাঝে যেন বিরতি চলে না আসে। বরং স্বাভাবিকভাবে ক্বিরাত পড়ব কিন্তু অত্যন্ত ধীর লয়ে।

✓ অন্যান্য তাসবীহ আদায়ের ক্ষেত্রে বাক্যগুলোকে শব্দে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করব। প্রতি শব্দের মাঝে এক/দুই তাসবীহ পরিমাণ (একবার সুবহানাল্লাহ বলতে যতটুকু সময় লাগে,তা হচ্ছে এক তাসবীহ পরিমাণ) বিরতি দিব। যেমন: সুবহানা... (এক/দুই তাসবীহ পরিমাণ বিরতি)... রাব্বিয়াল ..... আযীম। কিংবা আত্তাহিয়্যাতু...... লিল্লাহি..... ওয়াস্সালাওয়াতু.......

তবে খেয়াল রাখতে হবে, তিন তাসবীহ পরিমাণ বিরতি দিলে আবার নামায ভেঙে যাবে।

✓ সিজদা হতে সোজা হয়ে পড়ার দুআ সম্পূর্ণ পড়া (রাব্বানা... লাকাল... হামদ... হামদান... কাছিরান... ত্বয়্যিবান... মুবারাকান... ফীহি...), দুই সিজদার মাঝের দুআ (আল্লহুম্মাগফিরলী... ওয়ার হামনী.....ওয়ারযুকনী... ওয়া আ'..ফিনী... ওয়াহ্‌দি..নী...) ইত্যাদি নফল বা মোস্তাহাব দুআগুলোও আদায় পড়া।

✓ তাহাজ্জুদ নামায বা কিয়ামুল্লাইলে দীর্ঘ সূরা, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদার মশক করতে হবে।

• ধাপ-৫: অর্থের প্রতি খেয়াল করা:

এই ধাপে এসে আমাদেরকে নামাযের প্রতিটা শব্দের অর্থের প্রতি খেয়াল করতে হবে। ক্বিরাত চলমান অবস্থায় আর অন্যান্য তাসবীহাত পড়ার সময় একটি শব্দ উচ্চারণ করার আগেই তার অর্থ যেন আমার অন্তরে চলে আসে যে, আমি এখন এই শব্দটি বলতে যাচ্ছি। এইভাবে পুরো নামাযের প্রতিটি শব্দের অর্থের প্রতি খেয়াল করা। অর্থাৎ দীলের মাঝে আগে অর্থকে উপস্থিত করা, পরে শব্দটি মুখে উচ্চারণ করা।

• ধাপ-৬: ভাবের দিকে খেয়াল করা:

একটি শব্দ মুখে উচ্চারণ করার আগেই তার অর্থ আমার অন্তরে আসতে হবে, আর অর্থটি যে ভাব নির্দেশ করে তা অর্থের আগে আসতে হবে। এভাবে প্রতিটি শব্দের অর্থ চিন্তা করার আগে অতি স্বল্প সময়ের মাঝে সেই শব্দের ভাব অন্তরে নিয়ে আসতে হবে। যেমন: নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয় "আল্লাহু আক্বার "। এটি বলার আগে আমাকে প্রথমে ভাব আনতে হবে যে আমি এখন আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে যাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা কত মহান, কত বড়! এরপর চিন্তা করব আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তার মানে হলো "আল্লাহ বড়"। এরপর মুখে উচ্চারণ করব "আল্লাহু আকবার"। মুখে উচ্চারণ করার সময়ও ভাব জারি রাখা এবং অর্থের প্রতি খেয়াল রাখা। নতুন শব্দ বা ভাব আসলে সেদিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করা, পূর্বের শব্দ নিয়ে চিন্তা না করা, পূর্বের ভাব

দীলের মাঝে না রাখা। এই নামায 'সিদ্দীক' পর্যায়ের বান্দাদের নামায নামায, যারা নামাযেও সত্যবাদী। মুখে যা বলে, অন্তরে সেই ভাব উপস্থিত। আর আমাদের নামাযের অবস্থা হলো, নামাযের মধ্যে মুখে বলি 'আল্লাহ তোমার প্রশংসা করছি', কিন্তু দীল দ্বারা প্রশংসা করছি না; নামাযে মুখে বলছি 'তোমাকেই ভয় পাই', দীলের মাঝে ভয় নাই; নামাযে মুখে বলছি 'তোমার অনুগত বান্দা ছাড়া আর কারো সাথে সম্পর্ক নাই', বাস্তব জগতে ত্বগুতের গোলামী করছি। যারা নামাযের ভিতর মুখে যা বলে আর যাদের দীলের হালত ও কাজেকর্মে তা প্রকাশ পায়, তারাই সিদ্দিক, তারাই আল্লাহর কাছে প্রকৃত সত্যবাদী।

বিষয়টি আপনাদের কাছে কি কঠিন লাগছে?

আরো সহজভাবে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মনে করুন, আপনি বিদেশে গিয়েছেন, আপনি একাকী, সেখানে কেউ আপনার মাতৃভাষা বুঝে না। মনে করুন, সেখানে সবাই ইংরেজি বুঝে। আপনার খাবারের প্রয়োজন। দোকানে গেলেন। দোকানদারের কাছে খাবার চাইলেন, Brother, please, give me some food. খেয়াল করুন। আপনি যখন এ বাক্যটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, তখন আপনার অন্তরে বাক্যটির অর্থ পুরোপুরিভাবে উপস্থিত ছিল। তাই না? যার অর্থ, "ভাই, দয়াকরে, আমাকে কিছু খাবার দিন।" এবার আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনি কেন খাবার চাইলেন? সহজ উত্তর, কারণ আপনার ক্ষুধা লেগেছে, তাই আপনি আপনার হৃদয়ে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। ঠিক নয় কি?

"ক্ষুধার কারণে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি"ই হচ্ছে "Brother, please, give me some food." বাক্যটির জন্য ভাব।

খেয়াল করুন, সবার আগে আপনার ক্ষুধা লেগেছে; এরপর আপনার মনে খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে (ভাব); তারপর আপনি চিন্তা করলেন, খাবার তো দোকান ছাড়া পাওয়া যাবে না, তাই দোকানদারের কাছে গেলেন; এরপর আপনার মনে একটি বাক্য বা কিছু শব্দ এসেছে "ভাই, দয়াকরে, আমাকে কিছু খাবার দিন।" এবার দোকানদারের ভাষায় বললেন, "Brother, please, give me some food."

এবার আসুন নামাযে! নামাযের প্রতিটি শব্দের বা বাক্যের জন্য এরকম একটি ভাব আছে। ভালোভাবে বুঝে নিন, এই ভাব আনয়ন করার মেহনত করাই হচ্ছে নামাযকে 'নবীওয়ালা বা সাহাবাওয়ালা নামায' বানানোর মেহনত।

নামাযের একটি বাক্যের ভাবের উদাহরণ দিচ্ছি। এটিকে পূর্বের খাবার গ্রহণের ভাবের উদাহরণের সাথে মিলাই। খেয়াল করুন, আমি যদি আমার যিন্দেগীর দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, কত গুনাহই না করেছি বা করছি (ক্ষুধা); তাই আমার হিদায়াত লাভ করা দরকার, গোমরাহী থেকে বেঁচে সরল-সঠিক পথ পাওয়া দরকার (খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে- ভাব); এবার চিন্তা করছি, আমাকে হিদায়াত তো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না, তিনি ছাড়া আর কে আছে যে আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখাবে? তাই আল্লাহর কাছেই চাইব, তাই নামাযে দাঁড়িয়েছি (এবার দোকানদারের কাছে আসা হল); এবার আল্লাহর কাছে

কিভাবে চাইব, মনে একটি প্রার্থনা আসল “আমাকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিন” (ঠিক সেই বাক্যটির মতো “ভাই, দয়াকরে, আমাকে কিছু খাবার দিন।”); কিন্তু নিজের ভাষায় বললে তো আর নামায হবে না, তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে ভাষায়, যে বাক্যে শিখিয়েছেন সে ভাষায়, সে বাক্য ও শব্দে বলতে হবে “ইহ্‌দিনাছ্‌ ছিরত্বল মুস্তাকীম” (ঠিক যেন “Brother, please, give me some food.”)। এটিই হলো নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা নামায!!!!!

আশাকরি এবার ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন।

- **ধাপ-৭: নামাযের বাহিরের কিছু কাজ:**

পূর্বোক্ত নিয়মে নামায আদায় করতে থাকলে খুব শীঘ্রই নামাযে ধীরতা-স্থিরতা (খুশু খুযু) তৈরি হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আরো উন্নত অবস্থাসমূহ তৈরি করতে চাইলে নামাযের বাহিরে কিছু মেহনত আবশ্যক। যেমন:

✓ মানুষ নামাযের বাহিরে যে বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নামাযের ভিতরেও তার খেয়াল হতে থাকে। তাই দুনিয়ার ব্যস্ততা কমাই। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে নামাযের জন্য মসজিদে হাযির হই, যেন মনটা স্থির হতে পারে।

✓ নামাযের বাহিরে মানুষ যে বিষয়ের খুব বেশি চিন্তা বা স্মরণ করে, নামাযের মাঝেও সে বিষয়ের দিকে মন চলে যায়, তার চিন্তা বা স্মরণ দীলে আসতে থাকে। তাই নামাযের বাহিরেও নামাযের ভিতরের হালতগুলোর মুরাকাবা করি। বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করি। এমন

একটা অবস্থা যেন হয়, আল্লাহর স্মরণের ক্ষেত্রে নামাযের ভিতর বাহির সমান হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা সব সময়ই তো বর্তমান রয়েছেন।

✓ পেট ভর্তি থাকলে মাথায় নানা রকমের চিন্তা আসে। তাই কম খাওয়ার অভ্যাস করলে, ক্ষুধার্ত থাকলে অন্তর নির্মল-পরিচ্ছন্ন ও শান্ত হয়ে যায়, ফলে নামাযের বাহিরে অন্তর ছুটে যায় না। এটিই নফসে মুতমায়িন্নাহ ('প্রশান্ত আত্মা'র হালত)। নামাযকে প্রাণবন্ত করতে 'পেটে ক্ষুধা' অদ্বিতীয় ঔষধ। খেয়াল করে দেখবেন, নামাযের মধ্যে আমাদের মন হয়তো অতীতে, নয়তো ভবিষ্যতে চলে যায়। কিন্তু না! নামাযের মধ্যে অন্তরকে বর্তমানে স্থির করতে হবে। বর্তমানে আপনি যা করছেন, বা বলছেন, সেদিকে মনকে স্থির করতে হবে। আর পেটের ক্ষুধা ছাড়া কোনোভাবেই আপনি নামাযে মনকে বর্তমানে বেঁধে রাখতে পারবেন না, অসম্ভব!!!

✓ সকল প্রকার আত্মিক ও বাহ্যিক গুনাহ হতে বাঁচতে হবে। কেননা গুনাহ করলে অন্তর কালো রূপ ধারণ করে, তাতে আল্লাহ তাআলার হিদায়াতের নূর পতিত হয় না। নামাযের নূরও পয়দা হবে না।

এভাবে আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হই। নবীওয়ালা নামায বানানোর জন্য বারবার মশক করতে করতে আমাদের নামাযের অবস্থাও ইনশাআল্লাহ উন্নতির দিকে যাবে। বান্দার চেষ্টা করার স্তর এই পর্যন্তই। এরপর বান্দার আর কিছুই করার নেই। এর পরের অবস্থাগুলো আল্লাহর তাআলা যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীওয়ালা নামায দান করুন। আমীন।

֍ সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত ও নফল ইবাদতের এহতেমামঃ

প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরয নামাযের আগে ও পরে কিছু সুন্নত (মুআক্কাদা ও গাইরে মুআক্কাদা) নামায রয়েছে, যেগুলোর খুব এহতেমাম করা চাই। বিশেষ করে আসরের আগের চার রাকাত সুন্নত ও ঈশার আগের চার রাকাত সুন্নতের এহতেমাম করা।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম, যে সকল নফল নামাযের বেশি বেশি এহতেমাম করতেন সেগুলো হলোঃ

১. **তাহাজ্জুদঃ** নফল নামাযের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি এহতেমাম করতেন তাহাজ্জুদ নামাযের। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ

"(হে নবী!) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্যে দন্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দন্ডায়মান হয়।" (৭৩ সূরা মুয্যাম্মিলঃ ২০)

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ (প্রায় ৮ ঘন্টা), বা অর্ধাংশ (প্রায় ৬ ঘন্টা) বা এক তৃতীয়াংশ (প্রায় ৪ ঘন্টা) তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তাঁরা অত্যন্ত মজা করে রাত্রির ইবাদত করতেন। লম্বা লম্বা তিলাওয়াত, লম্বা লম্বা রুকু আর লম্বা লম্বা সিজ্‌দা, এক কথায় লম্বা লম্বা রাকাতে নামায আদায় করতেন। তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলায় সেগুলোর উপর আমল করতেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এত দীর্ঘ তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত।

ঈমানী এবং আমলী যিন্দেগী গঠনের জন্য তাহাজ্জুদের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়, কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের রীতি, তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের বিরাট মাধ্যম, গুনাহ মাফীর কারণ, আর এটা মানুষকে পাপকাজ থেকে বিরত রাখে।" (তিরমিযী)

হাশরের ময়দানে যখন হিসাব-নিকাশ শুরু হবে, তখন প্রথমে একদল লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এরা হবে তারা, রাতে যাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক থাকতো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু তাঁর খিলাফতের সময় এক সকালে মসজিদে বসে নবুয়তের যামানায় সাহাবায়ে কেরামের রাতের ইবাদতের বর্ণনা দেন এভাবে, "খোদার কসম, আমি মুহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবীদের দেখেছি। কিন্তু আজ আমি তাদের মতো কাউকে দেখতে পাই না। সকালবেলা তাদের চেহারা ফ্যাকাসে, চুল এলোমেলো ও শরীর ধুলাবালিযুক্ত থাকতো। অধিক সেজদার কারণে তাদের কপালে বকরীর হাঁটুর ন্যায় চিহ্ন দেখা যেতো। তারা সারারাত সেজদায় ও নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কাটাতেন। রাতভর কখনো কপালের উপর, কখনো পায়ের উপর আরাম লাভ করতেন। সকালবেলা এমনভাবে হেলেদুলে আল্লাহর যিকির করতেন, যেমন ঝড়ো বাতাসের দিনে গাছপালা দুলতে থাকে। আর তাঁদের চক্ষুদ্বয় হতে এমন অশ্রু প্রবাহিত হতো যে তাদের কাপড় ভিজে যেতো। কান্নার কারণে তাদের চোখ ফুলে যেতো,

মনে হতো যেনো তারা রাতভর ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন।” এ কথাগুলো বলে আলী রদিয়াল্লহু আনহু সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাহাজ্জুদের এই দৌলত দান করুন। আমীন।

২. **সালাতুল হাজাতঃ** সাহাবায়ে কেরাম সালাতুল হাজাতের অনেক বেশি এহতেমাম করতেন। যে কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই তারা নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহ তাআলার কাছেই চাইতেন। পেটে ক্ষুধা, ঘরে খাবার নেই, তো মসজিদে চলে গিয়েছেন, নামায পড়ে আল্লাহর কাছেই চেয়েছেন, এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তাঁরা এর জন্য নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন, আল্লাহর কাছেই চাইতেন।

৩. এছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম **ইশ্‌রাক, চাশত, আওয়াবীন, সালাতুস্‌ সবর, সালাতুশ্‌ শোক্‌র, সালাতুল ইস্তেখারা** ইত্যাদি নফল নামাযের বেশি বেশি এহতেমাম করতেন।

৪. **জুমুআর দিন হচ্ছে উম্মতের জন্য সাপ্তাহিক ঈদ।** এই দিনের নফল ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত সাতটি বিশেষ আমল রয়েছে, যেগুলো করলে দিনটিতে প্রতি কদমে এক বছরের নফল নামায ও এক বছরের নফল রোযার সওয়াব হাছিল হয়। সহীহ হাদীস সমূহে অন্য কোনো নফল আমল সম্পর্কে এতো হাদীস বর্ণিত হয়নি। তাই আমলগুলো গুরুত্বের করা চাই-

১। গোসল করা (জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে)।

২। নিজের কাছে যেসমস্ত পোষাক রয়েছে, সেগুলো হতে সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করা।

৩। মসজিদে জলদি উপস্থিত হওয়া (আযানের পূর্বেই)।

৪। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

৫। ইমাম সাহেবের নিকটে বসা।

৬। মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা।

৭। কোন অহেতুক বা বেফায়দা কাজ না করা।

উল্লেখ্য, শুক্রবারের ফায়দা পাওয়ার জন্য সালাফদের অনেকে আগের দিন আছর থেকে মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে চলে আসতেন।

উপরোক্ত আমলসমূহ ছাড়াও আরও কিছূ আমল রয়েছে, যেগুলো জুমু'আর দিন বিশেষভাবে করা চাইঃ

০ জুমু'আর দিনে ফযরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ্ ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহ্‌র তিলাওয়াত করা।

০ আতর বা সুগন্ধি লাগানো।

০ সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।

০ অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়া।

০ সালাতুত্‌-তাসবীহ (নামায) পড়া।

০ দুই খুতবার মাঝখানে ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসেন, তখন দু'আ কবুল হয় কাজেই জিহবা নাড়াচাড়া না করে চুপে চুপে মনে মনে দু'আ করা।

০ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের সময়টি দু'আ কবুল হওয়ার সময় সুতরাং এই সময় বিশেষভাবে দু'আ ও ইবাদতে মগ্ন থাকা।

খ. নিয়মিত তিলাওয়াত করা

কুরআন কারীম মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কুরআন কারীমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এটি এমন গ্রন্থ যার নযীর পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকে দেয়া হয় নাই, অন্য কোনো মাখলূককে তো নয়ই। এটি এমন কিতাব, তা বুঝে, না বুঝে যেভাবেই পড়া হোক সওয়াব হবেই, এমনকি না পড়ে কালো অক্ষর গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও সওয়াব হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক জাতির একটি গর্বের বস্তু থাকে, আর মুসলমানদের গর্বের ধন হচ্ছে কুরআন কারীম।" তিনি ﷺ আরো বলেন, "তোমরা ঐ জিনিসের চেয়ে অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য বেশি হাছিল করতে পারবে না, যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে।" তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে, এবং অন্যকে শিখায়।"

নামাযের বাহিরে সর্বোত্তম নফল ইবাদত হলো কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা। প্রিয় নবীজী ﷺ এরশাদ করেন, "কুরআন কারীমের প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি নেকী পাওয়া যায়।" হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নামাযের বাহিরে ওযু ছাড়া প্রতি হরফে দশ নেকী, নামাযের বাহিরে ওযু সহ পচিঁশ নেকী, নামাযের ভিতরে বসে বসে পড়লে পঞ্চাশ নেকী আর নামাযের ভিতর দাঁড়িয়ে পড়লে প্রতি হরফে একশ নেকী পাওয়া যায়।"

সাহাবায়ে কেরাম কুরআন কারীমের তিলাওয়াতের খুব বেশি এহতেমাম করতেন। তাঁদের তিলাওয়াতের মাত্রা ছিল- সর্বনিম্ন দিনে এক পারা, কেউ কেউ প্রতিদিন এক মঞ্জিল করে, কেউ দিনে দশ পারা করে আবার কেউ কেউ দিনে এক খতমও দিতেন। তাছাড়া ফযরের পর সূরা ইয়াসীন, মাগরীবের পর সূরা ওয়াক্বিয়া এবং ঈশার পর সূরা মূলক/আলিফ-লাম-মিম সিজ্দাহ/ দোখান/হা-মীম সিজদাহ তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও যোহরের পর সূরা ফাত্হ, আছরের পর সূরা নাবা পড়তেন বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাই অর্থ বুঝি আর না বুঝি, বেশি বেশি তিলাওয়াতের এহতেমাম করা। কেননা **কুরআনের কারীমের হক হলো সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনে এক খতম দেয়া।** চল্লিশ দিনে এক খতম দিলেও অনেক দেরি হয়ে যায়। কমপক্ষে ত্রিশ দিনে এক খতম দেয়া দরকার। আমরা যারা তিলাওয়াতই পারিনা, তারা নিয়ত করে চেষ্টা করতে থাকি। অনারবদের জন্য জরুরি হলো- 'নফসে তিলাওয়াতের' পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সময় আমল করার নিয়তে অর্থ বুঝার জন্য চেষ্টা করি। অর্থ পড়ার সময় প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামা, অর্থ নিয়ে চিন্তা করা, আমল করার ফিকির করা, অর্থ অনুসারে আল্লাহর কাছে দুআ করা। যেমনঃ আযাবের আয়াত আসলে পানাহ চাওয়া, পুরস্কারের আয়াত আসলে তা চাওয়া ইত্যাদি।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো আমরা সকলেই কুরআনকে বয়কট করেছি। সকলেই তিলাওয়াত ছেড়ে দিয়েছি। আজ আমি আলেমও তিলাওয়াত করিনা, সাধারণ দ্বীনদাররাও তিলাওয়াত করিনা, দাওয়াত ও

তাবলীগের সাথীও তিলাওয়াত করিনা, মুজাহিদও তিলাওয়াত করিনা। যেমন কুরআন কারীমে এরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ مَهْجُوراً

“রসূল বললেন: হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে।” (২৫ সূরা ফুরকান: ৩০)

কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী থেকে কুরআন কারীমকে তুলে নিবেন। কেন? কুরআনের প্রতি মুসলমানদের অবহেলার কারণে। একেতো তিলাওয়াত নাই, যারা তিলাওয়াত করি, আমল করি না। তাই আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী সকলের জন্য জরুরী একটি আমল হলো - প্রতিদিন অন্ততঃ এক পারা করে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা ও সে অনুযায়ী আমলের ফিকির করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গ. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (২ সূরা বাকারা: ১৫২)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"আর তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (৬২ সূরা জুমুআ: ১০)

ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।"

(১৩ সূরা রা'দ: ২৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার তামান্না করো না। যুদ্ধ না হওয়ার দুআ কর। তবে যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হবে, তখন অবিচল থাকবে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, দারিমী)

সাহাবায়ে কেরামের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করা। আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা তাঁদের জিহ্বা তরতাজা থাকত। এই আমলটির গুরুত্ব অপরিসীম। সাহাবায়ে কেরামের আত্মিক, সামরিক শক্তির মূল রহস্য ছিল যিকরুল্লাহ। বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে থাকবেন, তাকে মদদ-নুসরত করবেন, তার অন্তরকে প্রশান্ত করে দিবেন। যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা কখনো তার হাতকে ফিরিয়ে দিবেন না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যখনই আল্লাহর রাসূলের নিকট আসতেন তখনই যিকরুল্লাহর তালকীন করতেন। এতে নবীজী ﷺ মনে করতেন, যিকির ছাড়া বুঝি আর কোনো আমল নেই। এতেই বুঝা যায়, যিকরুল্লাহর গুরুত্ব কতটা অপরিসীম। একজন মুজাহিদের জন্য যিকির "পারমানবিক বোমা"র চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র, সন্দেহ নেই! তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই এমন হওয়া উচিত, দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়, এক কথায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর তাআলার যিকিরে জিহ্বাকে সতেজ রাখা।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যিকির হলো-

- সকাল বিকাল নিম্নোক্ত তাসবীহ সমূহ পাঠ করা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَعَلٰي اٰلِ مُحَمَّد — একশত বার।

اَسْتَغْفِرُ الله — একশত বার।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ — একশত বার।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ (কালিমায়ে সুওম) একশত বার।

- সকাল সন্ধ্যার মামূলাতসমূহ (বাদ ফযর ও বাদ মাগরিব) আদায় করা, যেমন:

১. আয়াতুল কুরসী
২. তিন কুল (সূরা ইখলাস-৩ বার, সূরা ফালাক-৩ বার, সূরা নাস-৩ বার)
৩. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত
৪. সাইয়্যিদুল ইসতিগফার
৫. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ- ০৭ বার
৬. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْس- ০৭ বার, ইত্যাদি।

এগুলো ছাড়াও কুরআন হাদীছে বর্ণিত অনেক আমল আছে, যেগুলো সাধ্যমতো করার চেষ্টা করা।

- জায়গায় জায়গায় মাসনূন দুআ সমূহ আদায় করা। যেমন, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দুআ, ইস্তিঞ্জায় প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দুআ, কাপড় পরিধানের দুআ, কাপড় খোলার দুআ, ঘরে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দুআ, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দুআ, সফরের দুআ, সহবাসের দুআ ইত্যাদি; এভাবে প্রত্যেকটি কাজে কর্মেই আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যিকির। তাই এগুলোর খুব বেশি এহতেমাম করা উচিত।

- এগুলোর বাহিরে চলতে ফিরতে সব সময় لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ-র যিকির জারী রাখা। যে যত পারি প্রতিদিন এই পবিত্র কালিমার যিকির করি- এক

হাজার, দুই হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার। যত বেশি পারা যায় এই যিকির দ্বারা আমরা আমাদের জিহ্বাকে তরতাজা রাখি। হযরত আবূ দারদা রদিয়াল্লহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি দিনে কতবার কালিমা/তাসবীহ পাঠ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, এক লক্ষ বার। তবে মাঝে মধ্যে সংখ্যার একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়।

আমাদেরও উচিত এই কালিমা বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করা।

ঘ. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

"অবশ্যই আল্লাহ তাআলা নবীর উপর রহমত (দরূদ ও সালামরূপে) পাঠান এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পড় এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সালাম প্রেরণ কর।" (৩৩ সূরা আহযাব: ৫৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ল, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন।" (মুসলিম-৩৮৪,৪০৮)

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করবে।" (তিরমিযী-৪৮৪)

নবীজী ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম আলোচিত হয়েছে, আর সে আমার উপর দরূদ পড়েনি সে হচ্ছে বখীল বা কৃপণ।" (তিরমিযী-৩৫৪৬)

সর্বোত্তম দরূদ শরীফ- দরূদে ইবরাহীম (যেটি নামাযে পাঠ করা হয়)।

সবচেয়ে ছোট দরূদ শরীফ- اللهم صلى على محمد وعلى أل محمد

আমরা সকলেই চেষ্টা করি, এই ছোট দরূদটি প্রতিদিন কমপক্ষে যেন ১০০০ বার পড়া হয়, যারা আরো বেশি পড়তে পারবো আরো ভালো, ৩০০০ বা ৫০০০ বা আরো অধিক। তবে ১০০০ এর কম না হওয়া চাই। আল্লাহর ওলী হতে চাই, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের ﷺ নৈকট্যশীল হতে চাই, কিন্তু দরূদ পড়তে পারবো না, তাহলে এটি একটি আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র!

নবীজী ﷺ এর উপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা তাঁর প্রতি মহব্বতের একটি নিদর্শন। বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা এবং বেশি বেশি তাহাজ্জুদের এহতেমাম না করা পর্যন্ত কেউ কোনোদিন আল্লাহর ওলী হতে পারেননি। যার সাথে আল্লাহর রাসূলের ﷺ মহব্বতের সম্পর্ক হবে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসবেন না, তা কখনো হতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে দরূদ পাঠ করা হলে আল্লাহ তাআলা বিশেষ ফেরেশতার মাধ্যমে নবীজীর ﷺ রওজা মুবারকে পৌঁছে দেন আর নবীজী ﷺ সেখান থেকে উম্মতের সালামের জবাব দেন। দরূদ শরীফ আল্লাহ তাআলার দরবারে অবশ্যই কবুল হয়। তাই দুআর আগে এবং দুআর পরে দরূদ পাঠ করা হলে, সেই দুআ অবশ্যই কবুল হবে, ইনশাআল্লাহ। কেননা

আগে পরের দরূদ কবুল করবেন আর মাঝখানের দুআ ফেলে দিবেন, আল্লাহ তাআলা এমন কৃপণ নন। তাই আমাদের বেশি বেশি দরূদের এহতেমাম করা উচিত। হে আল্লাহ! তোমার হাবীবের প্রতি লাখো কোটি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। আমীন।

ঙ. বেশি বেশি দুআর এহতেমাম করা

আল্লাহ তাআলার কাছে খুব বেশি দুআ করতে থাকা। এটিও একটি উত্তম যিকির (আল্লাহর যিকির)। কেননা দুআর সময় মন আল্লাহ তাআলার দিকে বেশি ঝুঁকে এবং আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি বেশি উপলব্ধি হয়। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, শুয়ে থাকা অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে থাকা। আরবীতে দুআ করা উত্তম। তবে নিজের ভাষায় যদি মনোযোগ বেশি থাকে তাহলে সেটিই উত্তম। হাত তুলে দুআ করতে হবে মোটেও জরুরী নয়। মনে মনে, অনুচ্চ আওয়াজে, উচ্চ আওয়াজে যে কোনো ভাবেই দুআ করা যায়। এত বেশি দুআর এহতেমাম করা যেন মনে হয় 'আমি সবসময় আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলছি'। দুআ আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করে থাকেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দুআ করতে হবে। হয়ত সাথে সাথে কবুল হবে, নয়তো যখন বান্দার জন্য খাইর হবে, তখন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দিবেন, নতুবা আখিরাতে তো অবশ্যই দিবেন, আর এটিই সর্বোত্তম প্রতিদান। দুআ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা, দুআ শেষ করার পরও দরূদ শরীফ পাঠ করা ও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে শেষ করা। দুআ কবুলের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত "কামাই রুজি হালাল হওয়া"।...........

এগুলো তো গেলো ফিকাহশাস্ত্রের আলোচনা। কিন্তু বাস্তবতা?

বর্তমানে আমাদের কারো দুআ কবুল হয় না। আরাকান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন বা কাশ্মীরের লাখো মুসলমানদের ফরিয়াদ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে শূন্যহাতে ফিরে আসে, এর কারণ কী? ফিলিস্তিনে আজ ৭০ বছর ধরে ইসরায়েলিরা মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। কাশ্মীর, আসামসহ সারা ভারতে সবসময়ই মুসলমানরা অত্যাচারিত, নির্যাতিত। ইরাকে মুসলমানদেরকে সেই ১৯৯০-৯১ সাল থেকে হত্যা করা হচ্ছে এবং তা এখনো চলছে। মায়ানমারের মুসলমানদের জবাই করে কলিজা চিবিয়ে খায় সেখানকার হায়াওয়ান বৌদ্ধরা। আফগানিস্তানেও একই অবস্থা। এক আফগানি লোক বললো, তোমরা মায়ানমারের ভিডিও দেখে ভাবছো ওদের উপর খুব জুলুম হচ্ছে। অথচ আফগানিস্তানের অবস্থা এ থেকেও ভয়াবহ, যা কখনো মিডিয়াতে আসেনি। সিরিয়ার এক মুসলমান বললো, আমাদের প্রতিদিন ছয় ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়। ফজর, যোহর, আসর, মাগরীব, ঈশা ও জানাজা। সিরিয়াতে সম্ভ্রান্ত মেয়েরা নিলামে বিক্রি হচ্ছে। কিতাবুল ফিতানে এক হাদীসে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম আবির্ভাবের পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তখন সিরিয়াতে আরবী সম্ভ্রান্ত মেয়েরা ২৫ দিরহামে বিক্রি হবে। হায়, এই হাদীসের বাস্তব রূপ এখন সিরিয়াতে চলছে। আর আমরা বেখেয়াল। দুনিয়া জুড়ে এতোসব জুলুমের শিকার মুসলমান আজ আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন করছেন না। আজ মুসলিম উম্মাহ দিশেহারা, জুলুমের শিকার। হজ্জের মৌসুমে লাখ লাখ হাজী উম্মতের এই জিল্লতি থেকে উদ্ধারের জন্য দুআ করে, কিন্তু

কোথায়? দিন দিন তো উম্মতের অবস্থা আরো অবনতিই হচ্ছে। ইজতেমার ময়দানে লাখ লাখ মুসল্লী হাত উঠায়, একই তো অবস্থা। প্রতিটি মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, মাহফিল- সব জায়গায় দুআ হচ্ছে। কিন্তু যেই সেই! তাহলে আমাদের দুআ কবুল হচ্ছে না কেন? অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“আর বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (আমি কোথায়?), বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।” (২ সূরা বাকারা: ১৮৬)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।”

(৪০ সূরা আল-মু’মিন: ৬০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম, পরবর্তী সালাফদের যিন্দেগীর এমন বহু ঘটনা কিতাবে পাওয়া যায়, তাঁরা হাত উঠিয়েছেন আর আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে কবুল করেছেন। যেমন: বৃষ্টি হয়না, তাই বৃষ্টির জন্য দুআ করেছেন, হাত নামানোর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড রোদ, দুআ করেছেন, আল্লাহ তাআলা মেঘ পাঠিয়ে দিয়েছেন, ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কী হলো যে, পুরো উম্মত এক হয়ে দুআ করলেও উম্মতের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না, আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসছে না?

ꕥ দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ:

১. সৎকাজে আদেশ-অসৎকাজে নিষেধ ত্যাগ করা (দাওয়াতের মেহনত না করা):

এক হাদীসে নবীজী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য এরশাদ ফরমান, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকো। অন্যথায় এমন সময় হয়তো এসে উপস্থিত হবে যখন তোমরা দোয়া করবে, কিন্তু দোয়া কবুল করা হবে না। তোমরা আমার নিকট চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদের চাওয়া পূর্ণ করবো না। তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য চাবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না।"

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উত্তম, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ দিবে, অসৎকাজে বাধা দিবে, এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১১০)

মদীনার লক্ষাধিক সাহাবীর মাঝে মাত্র সাড়ে দশ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে (বাকীয়ে গারকাদ)। তাহলে বাকী সাহাবীরা কোথায়? তাঁদের কবর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রচিত হয়েছে। হয়ত জিহাদ, নয়তো দাওয়াত-এই দুই মিশন নিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বব্যাপী। তাঁদের ত্যাগ-তিতীক্ষার বদৌলতে আজ আমাদের পর্যন্ত দীন পৌঁছেছে। কিন্তু বর্তমানে দাওয়াতের মেহনত বলতে গেলে প্রায়

উঠেই গিয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতও প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। যদিও কিছু সৎকাজে আদেশ বর্তমান আছে, অসৎ কাজে নিষেধ বলতে কিছু আর বাকী নেই। শাসকবর্গের যুলুম নির্যাতনের ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস উম্মত হারিয়ে ফেলেছে। উলামায়ে কেরাম নির্বাক যিন্দেগী যাপন করছেন। সাধারণ দ্বীনদারদের তো কথা বলার সাহসই নেই। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়াটাই মূলত "দাওয়াত ইলাল্লাহ"। মুসলমানদের মধ্যে যে দাওয়াত সেটি মূলত "সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধের" অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এমন দীনদার মুসলমানও পাওয়া যায়, যারা অমুসলিমদের দাওয়াতকে দাওয়াতই মনে করে না। যারা এটাকে 'দাওয়াত' মনে করে, তারা আবার বলে 'অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার সময় এখনো হয়নি'। অথচ আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সারা বিশ্বের অপরাপর উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ বানিয়েছেন, মুসলমানরা অমুসলিমদের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে অনন্তকালের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। কিন্তু আমরা কি সেই দায়িত্ব পালন করছি? এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা কেন আমাদের দুআ কবুল করবেন? আমরা যখন অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আজ আমরা মযলুম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দুআ কবুল হয়না। অথচ হাদীসে এসেছে, মযলুমের বদ দুআ থেকে বাঁচ। আল্লাহ তাআলা এবং মযলুমের দুআর মাঝে কোনো পর্দা নেই। আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে কবুল করে নেন। তাই আমাদের বিষয়গুলো খুব চিন্তা করা দরকার। দুআ কবুলের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব দিয়ে দাওয়াত দেয়া খেলাফে সুন্নতঃ

বর্তমান যামানায় অমুসলিমদের মাঝে যারা দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তাদের অনেকেই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (Comparative Religion) দিয়ে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত দেন। সেখানে তাদের ধর্ম এবং ইসলামের সাথে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়, তাদের ধর্মেও আল্লাহর রাসূলের ﷺ আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এসব উপস্থাপন করে তাকে দাওয়াত দেয়া হয়। এটিকে 'হিকমত' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি খেলাফে সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের মেজাজের পরিপন্থী। তাঁরা কখনো এভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেননি। সরাসরি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত, কিংবা কুরআন কারীম ও ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেই তাঁরা মানুষদেরকে দাওয়াত দিতেন।

একবার হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি বনু কোরায়যা (ইহুদী) গোত্রে আমার এক ভাইয়ের নিকট গিয়েছিলাম। সে আমার উপকারের কথা ভেবে তাওরাত হতে কিছু দরকারী কথা আমাকে লিখে দিয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে সেগুলো আপনার সামনে পেশ করতে চাই।" এ কথা শুনে রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু সাথে সাথে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, "আমরা আল্লাহ তাআলাকে রব, ইসলামকে পরিপূর্ণ দ্বীন, এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনেছি এবং এতে আমরা সন্তুষ্ট আছি।"

একথা শুনার পর নবীজী -এর চেহারা মুবারকের অসন্তুষ্টির ভাব দূর হয়ে গেল। তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আজ যদি মূসা আলাইহিস্ সালাম তোমাদের মধ্যে থাকতেন আর তোমরা যদি তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা হতে পথভ্রষ্ট। উম্মতের মধ্য হতে তোমরা আমার অংশে পড়েছ। নবীদের মধ্যে আমি তোমাদের অংশে পড়েছি।" (মুসনাদে আহমাদ)

২. জিহাদ ত্যাগ করা:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে) সাহায্য কর, আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে (সকল বিষয়ে) সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।"

(৪৭ সূরা মুহাম্মাদ: ৭)

এটি আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আর আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ)

হাদীসটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে-

✓ আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদকে দ্বীনের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। দ্বীনের অস্তিত্ব জিহাদের সাথে কিভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

✓ বর্তমান যামানার উম্মতের উপর এই যে অপমান-অপদস্তি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এসেছে, তিনিই চাপিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন ফিলিস্তিন মুসলমানদের দখলে থাকুক আর ইহুদীরা চাইতো তারা দখল করে নিবে, তা কখনোই সম্ভব হতো না, আল্লাহ তাআলাই ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর ইহুদীবাদের অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছেন। কেন? কারণ উম্মত জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী কিংবা অন্যান্য দুনিয়াবী বা দ্বীনী খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে। মায়ানমারের মুসলমানদের উপর আল্লাহ তাআলাই বৌদ্ধদের চাপিয়ে দিয়েছেন। কারণ কী? কারণ একটাই। আল্লাহ তাআলা সিরিয়ার মুসলমানদের নানা জাতির কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিয়েছেন, কারণ কী? কারণ একটাই? জিহাদ ছেড়ে দেয়া।

✓ বর্তমান এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ কেবল দুআ দিয়ে হবে না, জিহাদে ফিরে আসতে হবে। উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমভাবে জিহাদের জন্য তৈয়ার না হবে আল্লাহ তাআলাই একের পর এক জাতিকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে থাকবেন।

✓ দুনিয়াবী এবং দ্বীনী সকল কাজই করতে হবে, কিন্তু পুরোপুরিভাবে মশগুল হওয়া যাবে না, যাতে জিহাদের প্রয়োজনে যে কোনো সময় ময়দানে চলে যাওয়া যায়।

৩. খাহেশাতের অনুসরণ করা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান, "বেওকুফ ঐ ব্যক্তি যে তার নফসের খাহেশের অনুসরণ করে, আবার আল্লাহ পাকের দরবারে আশা করে।" এই হাদীসের মানে হলো, যে নিজের খাহেশ পূরণ করে, তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট কিছু আশা করা বোকামি। এদের দোয়া কখনো কবুল হয় না। সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ খাহেশে লিপ্ত। এদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে? আমরা তো আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব এরকম সকল খাহেশ পুরা করি। আর যেটা সামর্থ্যের বাইরে সেটার জন্য আফসোস করি। তাই আমাদের খুব তাওবা করা চাই। আমরা দিনে একবারের বেশি পানাহার পরিত্যাগ করি। নিজেদের দুর্গতির জন্য আমরাই দায়ী। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হলে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলবার তাওফীক দান করেন।

৪. আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর সাথে উম্মতের যিন্দেগীর মিল না থাকা:

আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়ামুক্ত এবং ঈমানদীপ্ত যিন্দেগীর সাথে আমাদের যিন্দেগীর মিল না থাকায় আমাদের দুআ সাহাবায়ে কেরামের দুআর মতো কবুল হয় না। তাই আমাদের সকলেরই উচিত নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গড়ার মেহনত করা।

❁ জিহাদের ময়দানে দুআর গুরুত্বঃ

আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে কবুল করানো খুব জরুরি। একবার আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দা হতে পারলে আমাদের দোয়ার দ্বারা আসমানের দরজা খুলবে। দুনিয়ার অবস্থার পরিবর্তন হবে। দোয়া মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

ঘটনাঃ ১ঃ দুই শব্দে আসমানের দরজা খোলে গেল

হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর খিলাফতকালে রোমানদের সাথে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে আট হাজার সৈন্য ছিল। হযরত আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লহু আনহু সেই জামাতের সেনাপতি ছিলেন। রোমানদের এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী অতর্কিতে হামলা করে সাহাবাদের চতুর্দিক ঘেরাও করে ফেলে। সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ ভাবলেন, আজকে হয়ত আমরা সকলেই মারা পড়ব। কারণ যখন কোনো দল ঘেরাওয়ের ভিতর পড়ে যায় তখন বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রদিয়াল্লহু আনহু একজন বড় সাহাবী যিনি সেই জামাতে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন এভাবে, আমরা আরবরা যুদ্ধের ময়দানে কবিতা পড়তাম আর নিজেদের সাহস যোগাতাম। অথচ সেই সময় আমাদের অবস্থা এমন হলো যে আমরা সবাই মৃত্যুকে সামনে দেখছিলাম ও কারও মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছিল না।

হঠাৎ আমাদের মুখ থেকে এই দোয়া বেরিয়ে আসল, "ইয়া রব্বা মুহাম্মাদ! উন্‌সুর উম্মাতা মুহাম্মাদ!" যার অর্থ "হে মুহাম্মাদ ﷺ এর রব, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতকে সাহায্য করুন।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রদিয়াল্লহু আনহুমা বলেন, এই দুআর সাথে সাথে আমরা একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আকাশ পানে চেয়ে দেখি আকাশের দরজা খুলে গেছে। আর সাদা ঘোড়ায় আরোহী ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনী সেখান থেকে আসা শুরু হলো, যাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল বর্শা, মাথায় ছিল পাগড়ি। সামনে ছিল তাদের সেনাপতি যিনি বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মাদ ﷺ, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের জন্য সাহায্য এসে গেছে। সেই জামাত নেমে আসল এবং নিমিষেই মুসলমানদের জয় হয়ে গেল।

সেই সকল সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের সাথে আল্লাহ পাকের সম্পর্ক ছিল, তাই দুই কথার দোয়াই আল্লাহ পাকের সাহায্য নামানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। আজ হাজারো কান্নাকাটির পরেও আল্লাহ পাকের সাহায্য আসছে না, তার কারণ আল্লাহ পাক আজ মুসলমানদের উপর নারাজ।

ঘটনা ২: ইয়ারমুকের যুদ্ধের সেই দিনটি

ইয়ারমুকের যুদ্ধ। মুসলমানদের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলোর একটি। রোমান কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ, এর মধ্যে আরব ছিলো বনু গাস্সান গোত্রের ৬০ হাজার। রোমানরা সিদ্ধান্ত নিলো সকালে মুসলমানদের সাথে মুকাবেলা করার জন্য বনু গাস্সানীরা অগ্রসর হবে। প্রথমে আরব-আরব মোকাবেলা হবে। গাস্সানীরা যখন ময়দানে নেমে আসলো মুসলমানরা খবর নিয়ে জানতে পারলো যে তাদের সংখ্যা ৬০ হাজার। মুসলমানদের সেনাপতি হলেন

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লহু আনহু। তিনি সাথীদের নিকট পরামর্শ চাইলেন, কিভাবে কাফেরদের মুকাবেলা করা উচিত।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আমার সাথে ৩০ জন সৈন্য দেয়া হোক, এদের সাথে মুকাবেলা করার জন্য আমার ৩০ জন প্রয়োজন। আবু সুফিয়ান রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, দেখো খালিদ, পাগলামি করো না, ৬০ হাজারের বিরুদ্ধে ৩০ জন নিতান্তই কম। খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু রেগে গিয়ে তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, কি হে আবু সুফিয়ান, জাহেলিয়াতের যুগে তো খুব বীর ছিলে, এখন এতো কাপুরুষ বনে গেলে কেনো? জবাবে আবু সুফিয়ান রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, কাপুরুষতা নয়। ৩০ জন খুবই কম, তুমি বরং ৬০ জন নিয়ে যাও। পাশ থেকে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, ভাই খালিদ, ৩০ জন খুব কম, তুমি ৬০ জন নিয়ে যাও।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু বললেন, ঠিক আছে। তবে আমার জন্য ৩০ জনই যথেষ্ট ছিল, কারণ আমাদের সাথে নবীজী ﷺ-এর এমন কয়েকজন সাহাবী আছেন, যাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠালে আল্লাহ পাক তাঁদের হাত কখনো খালি ফিরিয়ে দেন না। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রদিয়াদল্লহু বললেন, তাহলে যাদের তোমার পছন্দ হয় সাথে নিয়ে যাও। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু ডাক দিলেন, কোথায় ফজল বিন আব্বাস, কোথায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, কোথায় আমরে তামিমি, কোথায় রাফে বিন উমাইয়া.....। এভাবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু একে একে ১৬ জন জন মুহাজির ও ৪৪ জন আনসার সাহাবীদের ডাক দিলেন।

তারপর ৬০ জন পবিত্র মানুষের এই ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে অগ্রসর হলেন ৬০ হাজার বনু গাস্‌সানীদের সাথে লড়াই করার জন্য।

বনু গাস্‌সানীরা যখন দেখলো যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে অল্প কিছু মানুষ এগিয়ে আসছে। তারা ভাবলো, নিশ্চয়ই মুসলমানরা আমাদেরকে ভয় পেয়েছে ও সন্ধি করার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসছে। গাস্‌সানীদের সরদার বলে উঠলো, এই যে মুসলমানরা সন্ধির জন্য আসছে, আজ আমি এদের সামনে এমন সব শর্ত রাখবো যে, এরা সেই শর্ত পূরণ করতে যেয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর দল নিয়ে কাফেরদের সামনে উপস্থিত হলেন। কাফেরদের সর্দার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, ভয় পেয়েছো, সন্ধি করতে এসেছো? বাঁচতে হলে তোমাদেরকে এমন সব শর্ত পূরণ করতে হবে যা তোমরা পূরণ করতে অক্ষম। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, সন্ধি নয়, লড়াই করতে এসেছি। গাস্‌সানী সরদার বললো, লড়াই করতে হলে আরো লোকজন নিয়ে আসো, পাগলামি করো না। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, হিম্মত থাকলে লড়াই করে দেখো, দিন শেষে ময়দান কাদের দখলে থাকে। এতে গাস্‌সানীরা ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ শুরু করলো।

গাস্‌সানীদের আক্রমণ ছিলো প্রচণ্ড রকম। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু দেখলেন যে এতো বড় বাহিনীকে সামনাসামনি মোকাবেলা করে পরাজিত করা কঠিন হবে। তাই তিনি সাথীদের বললেন, ৬ জন ৬ জন করে দল হয়ে যাও, ৬ জন একসাথে বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়াও,

তারপর মোকাবেলা করো। সকলে তখন হুকুম অনুযায়ী বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে কাফেরদের আক্রমণ করা শুরু করলেন।

এদিকে মুসলমানদের শিবিরে সকলে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলো; কিন্তু ময়দানের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানার উপায় ছিলো না। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লহু আনহু নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না, বার বার নিজেকে তিরস্কার করে যাচ্ছিলেন, এতো অল্প লোক মোকাবেলায় পাঠানো ঠিক হয়নি। আজ যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই ৬০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে যান, তাহলে মুসলমানদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।..........

এমন সময় ময়দান থেকে তাকবীরের আওয়ায শুনা গেলো।........

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লহু আনহু ও অন্যান্য মুসলমানরা দ্রুত ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন ময়দান মুসলমানদের দখলে, কাফেররা ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে, আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু ৩০ জন সাহাবীর সাথে দাঁড়িয়ে আছেন ও চিৎকার করে কাঁদছেন, হায়, আজ আমার কারণে নবীজী ﷺ-এর ৩০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। একজন বললেন, না, আমাদের এতোজন শহীদ হননি, আসুন লাশ খুঁজে দেখি। তখন লাশ খুঁজাখুজি শুরু হলো। দেখা গেলো ৫০০০ গাস্‌সানী নিহত হয়েছে, আর ১০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। তাহলে বাকি ২০ জন কোথায়? সকলে তখন বুঝে নিলো যে, কাফেররা পালাবার সময় নিশ্চয়ই এই ২০ জন সাহাবী পিছু ধাওয়া করেছে এবং কাফেররা তাদের বন্দী করে ফেলেছে। এ ধারণা মনে হতেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু তরবারি হাতে দৌঁড়ে তাঁর

ঘোড়ায় উঠে বললেন, কাফেরদের উপর আক্রমণ করে সাহাবীদেরকে মুক্ত করতে হবে।

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ রদিয়াল্লহু আনহু তাঁকে থামাতে চাইলেন, ভাই খালিদ, সারাদিন যুদ্ধ করে তুমি ক্লান্ত, শরীরের কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে। তুমি বিশ্রাম নাও। আমরা অন্যরা যাচ্ছি তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, বিশ্রাম কবরে হবে, ইনশাআল্লাহ। এই বলে তিনি ঘোড়া হাকালেন, অন্যরাও তাঁর পিছনে ছুটে গেলেন সাহাবীদেরকে মুক্ত করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মুক্ত করেই তারা ফিরে আসলেন।

এই হলো সংক্ষিপ্তাকারে মূল ঘটনা।

মন্তব্যঃ

মুসলমানদের এই ইতিহাস আবারো পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ! কেননা সাহাবায়ে কেরামকে যেই আল্লাহ তাআলা মদদ-নুসরত করেছিলেন, তিনি তো চিরঞ্জীব, বেঁচে আছেন, তাঁর তো মৃত্যু নেই, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা অক্ষয়, অব্যয়। তাঁকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না, না যমীনে, না আসমানে। সর্বত্রই তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিদ্যমান। এভাবেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বাহিনীকে মদদ-নুসরত করবেন, সন্দেহ নেই। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে আল্লাহ পাকের মদদ-নুসরত লাভ করেছিলেন, সেভাবে যদি আমরাও পেতে চাই, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হতে চাই, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো- সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গঠন করা, নিজেদের আরাম ও বিশ্রামকে কুরবানী করে তা কবরের জন্য বাকী রাখা। তাহলেই এক

মুসলমান হাজারো কাফেরের জন্য যথেষ্ট হবে। আমাদেরকে এমন মুসলমানই হতে হবে, যার হাত আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন

চ. নবীজী ﷺ-কে কদম ব-কদম অনুসরণ করা

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনগণের মাঝে এমন এক জযবা ছিলো যে, নবীজী ﷺ-প্রতিটি কাজ যেভাবে সম্পাদন করেছেন আমাকে সেটি সেভাবেই করতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহাবাওয়ালা মেজাজ। মূলত এটি "এশকে রাসূলের" একটি বহিঃপ্রকাশ। যিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল ﷺ কিভাবে চলেছেন, কিভাবে কোন্ কাজটা করেছেন, কিভাবে কথা বলতেন, কোন্ জিনিসটা পছন্দ করতেন, কোন্ জিনিসটা অপছন্দ করতেন, কোন্ আমলটা বেশি করতেন, কোন্টা কম করতেন, কোন্টাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, কোন্টাকে কম গুরুত্ব দিতেন, এভাবে যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তা করা হয়, তাহলেই আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হবো। নতুবা আমাদের দ্বীনদারী হবে আমাদের নফসের মর্জিমাফিক। যেটা ভালো লাগবে সেটা করবো, যেটা ভালো লাগবে না সেটা করবো না। কিংবা কম গুরুত্বের কাজগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে যাবে, আর বেশি গুরুত্বের কাজগুলোকে গুরুত্বহীন মনে হতে থাকবে। তাই নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর দিকে সবসময় আমাদের লক্ষ্য রেখে কদম বাড়াতে হবে। তাহলেই কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ হবে। কেননা নবীজী ﷺ-র যিন্দেগী, তাঁর আখলাক, চালচলন, আমলসমূহ, সবই

মূলত কুরআন কারীমের বাস্তব অনুবাদ, কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর। এভাবে চলতে পারলেই এটি হবে সুন্নতী যিন্দেগী, কুরআনী যিন্দেগী, ইত্তেবায়ে সুন্নতের যিন্দেগী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَه‘ اَجْرُ مِئَاةِ شَهِيْدٍ

"আমার উম্মত যখন ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যাবে, তখন যে আমার সুন্নতকে আকড়ে থাকবে তাকে একশ শহীদের প্রতিদান দেয়া হবে।"

নবীজী ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যারা অস্বীকার করে তারা ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, অস্বীকারকারী কারা? তখন নবীজী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো স্পষ্টতই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলো।" (বুখারী)

তিনি ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জীবিত করলো সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।" (তিরমিজি)

সুতরাং,

কে আছে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চায়, সর্বোচ্চ জান্নাতে?

কে আছে একশ শহীদের মর্তবা লাভ করতে চায়?

- সে যেন আল্লাহর রাসূলের অপরিচিত সুন্নতগুলোকে জিন্দা করে, যা আমি এই কিতাবে বর্ণনা করেছি।

- সে যেন ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত প্রতিটি কাজের কী সুন্নত তা জেনে আমল করে।

- সে যেন আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীকে নিজের যিন্দেগী বানানোর মেহনত করে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ছ. আমলের নিয়তে উপকারী এলমে দ্বীন আগে হাসিল করা।

ইলমের ফাযায়েল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ

"আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে হিকমত (তথা দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান বা বুঝ) দান করেন আর যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, সে প্রভুত কল্যাণ লাভ করেছে। আর বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" (২ সূরা বাকারা: ২৬৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি এলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য পথ চলে, আল্লাহ পাক তাঁর জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন।"

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ পাক যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।"

তিনি ﷺ আরো বলেন, "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইলম অর্জন করা ফরযে আইন।"

হযরত জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লহু বলেন, "আমরা আমাদের নবীজী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শিখার আগে ঈমান শিখেছি। তারপর আমরা কুরআন শিখেছি। আর এভাবে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।"

কোন্ ইলম আগে শিখবো

সকল এলেম একবারে অর্জন করা ফরযে আইন নয়। একজন মানুষের যিন্দেগীতে তা ধারাবাহিকভাবে ফরয হয়। যেমন:

মনে করুন একটি ছেলে চাশতের ওয়াক্তে বীর্য স্খলনের দ্বারা বালেগ হলো, তাহলে তার উপর প্রথম ফরয কী? ঈমান আনা। তাহলে তার উপর এখন ফরযে আইন হচ্ছে **ঈমানিয়াত** শিক্ষা করা। আকাইদ শাস্ত্রের বিষয়সমূহ যেমন: কী কী বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে, কোন্ কোন্ আকীদার কারণে ঈমান নষ্ট হবে, কুফুরী, শিরকী, বিদআতী ইত্যাদি আকীদা সমূহ কী কী ইত্যাদি), এ সম্পর্কে আকাঈদের কিতাবসমূহে বিস্তারিত পাওয়া যাবে। এছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাপেক্ষা মহব্বত করা, গাইরুল্লাহর ভয় থেকে পাক হওয়া, আখিরাতের স্মরণ পয়দা করা, মৃতুর ভয় দূর করা, মৃত্যু তথা শাহাদাতকে মহব্বত করতে শিখা-

এগুলো মূল ঈমান, ঈমানের রূহ। এগুলোকে সর্বাগ্রে শিক্ষা করা। (এ সম্পর্কে "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী: গরীব ইসলাম" কিতাবের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে)

যেহেতু এখনো কোনো ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়নি, তাই এরপর এই ছেলের উপর ফরয হচ্ছে নামাযের প্রস্তুতি মূলক পবিত্রতা হাছিল করা। তাই এখন ফরযে আইন হচ্ছে **তাহারাতের ইলম** শিক্ষা করা (যেমন: গোসল, ওযু, তায়াম্মুম, পাক-নাপাকীর মাসআলা মাসাইল বিস্তারিত জানা)। (এ সম্পর্কে ফিকাহর কিতাবসমূহে বিস্তারিত পাওয়া যাবে)।

এরপর যখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল তখন তাকে নামায পড়তে হবে। তাই তার উপর ফরয হলো **নামাযের মাসআলা মাসাইল** শিক্ষা করা, **সাহাবাওয়ালা নামায কেমন ছিলো তা জেনে আমল করার চেষ্টা করা** (এ সম্পর্কে আলোচ্য কিতাবের ১৪২-১৫৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে)। এবং নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয হলো সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা। সুতরাং **কুরআন কারীম সহীহ শুদ্ধ করাও** তার উপর এখন ফরয।

এরপর তার উপর ফরয হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী মুক্ত যিন্দেগী গঠন করা, গুনাহমুক্ত পবিত্র যিন্দেগী গঠন করা। আর যেহেতু দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মাতা, তাই দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ইলম হাছিল করা এবং এ থেকে বাঁচা । এ ছাড়াও দুনিয়ার মহব্বত থেকে উৎপন্ন অন্যান্য ব্যধিসমূহ (যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে) সম্পর্কে ইলম হাছিল করা এবং এগুলো থেকে বাঁচার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। (দুনিয়া ও দুনিয়ার মহব্বত থেকে উৎপন্ন গুনাহসমূহের পরিচয় এবং

এ থেকে বাঁচার উপায়সমূহ সম্পর্কে "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীঃ গরীব ইসলাম" কিতাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে) যারা আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য হযরত ইমাম গায্যালি রাহিমাহুল্লাহর কিতাবসমূহ বিশেষত কিমিয়ায়ে সাআদাত অনেক সহযোগী হতে পারে। কিংবা আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

যেহেতু বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে, তাই কিছু নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির, দুআ ইত্যাদি সম্পর্কে ইলম হাছিল করবে এবং সে অনুযায়ী যথাসম্ভব আমল করার চেষ্টা করবে।

যেহেতু বর্তমান যামানায় জিহাদ সকলের উপর ফরয, সেহেতু জিহাদ সম্পর্কে ইলম হাসিল করা সকলের উপর ফরযে আইন। জিহাদের মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা করা, রণ কৌশল শিক্ষা করা, অস্ত্র-চালনা শিক্ষা করা, গোয়েন্দাগিরি শিক্ষা করা, শরীরচর্চা শিক্ষা করা- বর্তমান সময়ে সকলের উপর ফরযে আইন। এছাড়াও বর্তমান যামানায় ইমাম মাহদি আলাইহিস্ সালামের আগমনের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম সংক্রান্ত ইলম, দাজ্জাল, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম, শেষ যামানার আলামত ও ফেতনা সম্পর্কিত ইলম এবং যাবতীয় ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা করার ইলম হাছিল করা বর্তমান যামানার উম্মতের উপর ফরযে আইন হবে।

সামগ্রিকভাবে নবীওয়ালা যিন্দেগী বা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী অবলম্বন করা, দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাতমুখী যিন্দেগী গঠন করা, সাহাবাওয়ালা ঈমানী চেতনা গঠন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন।

তাই আমার লিখিত "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী: গরীব ইসলাম" কিতাবটির তিনটি খণ্ডই বারবার অধ্যয়ন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যদি চান, সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী চিনতে, তাঁদের ঈমানী চেতনার সাথে পরিচিত হতে এবং নিজেদের যিন্দেগী সেমতে গড়তে কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি আশা করি।

এভাবে যখন যে ফরয কাজ সামনে আসবে তার ইলম হাছিল করা তার উপর ফরয হবে। যেমন: যখন রমজান মাস এসে উপস্থিত হবে, তখন রোযার মাসাইল শিক্ষা করা ফরযে আইন হবে। যখন বিবাহ করার বয়স হবে, তখন বিবাহের এলেম, স্ত্রীর অধিকার, সন্তান-প্রতিপালনের ইলম শিক্ষা করা ফরযে আইন হবে। সে যদি ব্যবসা করে বা মজদুরি করে, কিভাবে হালাল রুজি অর্জন করতে হয়, তার ইলম হাছিল করতে হবে। যদি যাকাত দেয়া ফরয হয় কিংবা হজ্জ ফরয হয়ে থাকে, তখন এগুলোর ইলম হাছিল করতে হবে। যদি এগুলো ফরয না হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর ইলম হাছিল করা ফরয নয়।

এই পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন।

....

এরপর শুরু হচ্ছে ফরযে কিফায়া।

এরপর যারা পারেন, ইলমের সাগরে ঝাঁপ দিবেন, কুরআন ফিয্‌য করবেন, আরবী ভাষা, ব্যকরণ, নাহু-সরফ, ফিকাহ, তাফসীর, হাদীস, এক কথায় মাদরাসার সিলেবাসভূক্ত কিতাবাদি পড়বেন।

এভাবে প্রতিটি কাজ হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে করে, মাসআলা মাসাইল জেনে জেনে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে করে আমল করতে থাকা।

মোটকথা, আমরা একটা মূলনীতি মনে রাখবো- "এই মুহূর্তে আমার উপর যা ফরয, কিংবা আমি এখন যে কাজটি করতে যাচ্ছি, সে কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকার ইলম হাছিল করাই আমার উপর ফরযে আইন।

ৠ একজন হক্কানী আলেমের সীফতসমূহ

হযরত ইমাম গায্যালি রাহিমাহুল্লাহ আখিরাতমুখি আলেমদের কয়েকটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি এবং সাথে আমার কিছু বক্তব্যও যোগ করে দিচ্ছি:

১. এলেম দ্বারা দুনিয়া কামাই করে না। আলেমের সর্বনিম্ন স্তর হলো তার মধ্যে দুনিয়ার মূল্যহীনতা, নিচুতা, অপবিত্রতা ও তার ক্ষণস্থায়ীত্বের অনুভূতি থাকে। আর আখিরাতের মর্যাদা ও মূল্য এবং তার স্থায়িত্ব ও নেয়ামত উত্তম হওয়ার অনুভূতি থাকে। এই ধোকার ঘর দুনিয়া থেকে মন উঠে যাবে। আখিরাতের চিরস্থায়ী ঘরের দিকে মনোযোগী হবে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে।

২. তার কথা ও কাজের মধ্যে অমিল থাকবে না। অন্যদের ভালো কাজের হুকুম করেন, কিন্তু নিজে তার উপর আমল করবেন না এমন যেনো না হয়।

নবীজী ﷺ এরশাদ ফরমান, মিরাজের রাতে আমি একদল লোক দেখেছি যাদের ঠোট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিলো। আমি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন, এরা আপনার ঐ সকল ওয়ায়েজ ও বক্তা যারা অন্যদেরকে নসীহত করতো, কিন্তু তার উপর নিজেরা আমল করতো না।

কিয়ামতের দিন কিছু আলেমদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তাদের শরীর থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হবে যার কারণে অন্যান্য জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে বলতে থাকবে, তোমরা এমন কী আমল করেছো যার কারণে আজ তোমাদের এই দুরাবস্থা? আমরা নিজেদের মুসীবতে গ্রেফতার ছিলাম, তাই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তোমাদের দুর্গন্ধ আমাদেরকে আরো বেশি কষ্ট দিচ্ছে। তখন সেই আলেমরা উত্তর করবে, আমরা আমাদের এলেমকে দ্বীনি ফায়দার জন্য ব্যবহার করতাম না।

কেয়ামতের দিন যখন লোকদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন একদল জান্নাতী লোক যারা দুনিয়াতে আলেম ছিলো না, তারা একদল জাহান্নামী লোক যারা দুনিয়াতে আলেম ছিলো, তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনারা জাহান্নামে কেনো যাচ্ছেন? আমরা তো আপনাদের নিকট থেকেই দ্বীন শিখে আজ জান্নাতে যাচ্ছি। তখন সেই আলেমরা উত্তরে বলবে, আমরা তোমাদেরকে নসীহত করতাম, কিন্তু নিজেরা উহার উপর আমল করতাম না।

৩. এমন এলেমের চর্চায় মশগুল থাকেন, যা আখিরাতের জন্য উপকারী হয় এবং নেক আমলের জন্য উৎসাহিত করে। এমন এলেম থেকে বিরত থাকেন যা আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না।

৪. খানাপিনা ও লেবাস-পোশাকের ব্যাপারে উন্নতমান ও চাকচিক্যকে পরিহার করে। এই ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহুমার আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করি। যারা দুনিয়াতেও নবীজী ﷺ-এর পাশে ছিলেন, কবরেও তাঁর পাশে আছেন, হাশরের ময়দানেও তাঁর পাশে থাকবেন। একবার ওমর রদিয়াল্লহু আনহু একটি জামা পেয়ে পরিধান করলেন। উহার হাতা কিছুটা লম্বা ছিলো যাতে কবজি ঢেকে যাচ্ছিল। উনি একটি ছুড়ি দিয়ে হাতার অতিরিক্ত অংশটুকুতে একটু কাটলেন, তারপর টান দিয়ে তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। ফলে ছিড়া অংশে সূতা উঠে ঝুলেছিলো, কিন্তু তিনি এভাবেই পড়ে চলছিলেন। তখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রদিয়াল্লহু আনহুমা পিতাকে বললেন, হে আমিরুল মু'মিনিন, আপনার জামাটা আমাকে দিন, আমি হাতাগুলো সিলাই করে দেই। জবাবে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আমার তা প্রয়োজন নেই, ওমরের জন্য এরকমই যথেষ্ট।

৫. বাদশাহ ও সরকারী কর্মকর্তাদের থেকে দূরে থাকবেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন কোনো আলেমকে শাসকদের দরবারে পড়ে থাকতে দেখবে, তখন তাকে চোর মনে করবে। সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছেন, কিন্তু কখনো মাথা নত করেননি।

৬. তারা ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন না। বরং যদি অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম থাকে তা হলে তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

৭. তারা আধ্যাত্মিকতা অর্জনের দিকে মনোযোগী হবেন।

৮. ঈমান ও ইয়াকীন বানানোর প্রতি অনেক বেশি যত্নবান হবেন।

৯. তার চালচলন ও প্রতিটি কাজে আল্লাহর ভয় প্রতিফলিত হবে। কখনো সত্য ও হক কথা বলতে ভয় পাবেন না।

১০. ঐ সমস্ত মাসায়েলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যেগুলো আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে, হালাল-হারামের সাথে সম্পর্ক রাখে। এই রূপ এলেমের চর্চা করে না, যাতে লোকে তাকে বড় চিন্তাবিদ, দার্শনিক মনে করে। একথা মনে রাখতে হবে, এলেম আমল করার জন্য, মানুষের ময়দানে চটকদার বয়ান করার জন্য নয়। হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ভাষা পাণ্ডিত্য ও বয়ান করা শিখে, কিয়ামতের দিন তার ফরয-নফল কোনো ইবাদতই কবুল হবে না।

১১. নিজের এলেমের প্রতি বিচক্ষণতার সহিত নযর রাখে। শুধুমাত্র অন্য আলেমের কথার উপর অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণে অভ্যস্ত না হয়ে যায়। সব সময় সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

১২. নবীজী ﷺ-এর সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখেন, সকল বিদআতকে কঠোর ভাবে পরিহার করেন।

১৩. একজন হক্কানী আলেম কখনো 'জিহাদ বিরোধী' হতে পারেন না, অসম্ভব!!! বরং উম্মতে ক্রান্তিকালে তিনি উম্মতকে জিহাদের জন্য

উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে নিজেই অস্ত্র তুলে নিয়ে উম্মতকে রাহবারি করবেন।

১৪. যেহেতু তিনি নবীর ওয়ারিশ, তাই তাঁর যিন্দেগী হওয়া চাই নবীদের মতো, যেন তাকে দেখলে সাধারণ মানুষের দীলে নবীদের সুরত ভেসে উঠে। তাকে দেখে সাধারণ মানুষ নবীদের দ্বীনদারী শিখবে, তার আখলাক দেখে সাধারণ মানুষ নবীদের আখলাক শিখবে, তার আমানতদারিতা দেখে নবীদের আমানতদারিতা শিখবে, তার সাহস দেখে নবীদের সাহস চিনবে, তার ব্যক্তিত্ব দেখে নবীদের ব্যক্তিত্ব বুঝবে।

সবকিছুর পর, যদিও তিনি একজন আলেম, তিনি কিন্তু একজন উম্মত, প্রকৃত প্রস্তাবে নবী নন। তাই ভুল-ত্রুটি কিংবা গুনাহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভুল-ত্রুটি কিংবা গুনাহ যেন প্রকাশ্যে না হয়, এতে উম্মত বিগড়ে যাবে। তার যিন্দেগী যেন এমন না হয়, যেন উম্মত নবীওয়ালা যিন্দেগীকে ভুলে যায়, কিংবা গোমরাহী, দুনিয়ার মহব্বত আর দুনিয়া কামাইয়ের ধান্দাকে প্রকৃত দ্বীন মনে করা শুরু করে তাতে নিয়োজিত হয়ে যায় আর এর দ্বারা তার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যায়।

বন্ধুরা! এমন আলেম যদি পাওয়া যায়, তাঁর গোলাম হয়ে যাও। নিজের যিন্দেগীকে তাঁর কাছে সপে দাও। তাঁর খেদমত করে আল্লাহ তাআলার নেকট্য হাছিল করো। তাঁর জুতা সোজা করে দাও। তাঁর জুতা বহন করে নিজেকে মিটিয়ে দাও। তাঁর জন্য নিজের সর্বস্ব কুরবানী করে দাও। তার জন্য নিজের জীবন দিয়ে দাও। তাহলেই তুমি সফলকাম হবে।

ৠ ওহে মাদরাসার ছাত্ররা!

ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ আলেম হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দীনের বুঝ তোমাদের মধ্যে না আসবে। দীনের বুঝ হলো, নিজেকে দুনিয়ার প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখা এবং প্রতি কদমে কদমে দীলের মধ্যে এই খেয়াল রাখা যে, আল্লাহ পাক আমাকে কী হুকুম করেছেন এবং কী নিষেধ করেছেন। মাদরাসা থেকে পাশ করার নাম আলেম হওয়া নয়। বরং আলেম ঐ ব্যক্তি যে পরহেযগার হয়। সে কবীরা গুনাহ থেকে এই জন্য বেঁচে থাকে যে, তাকে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াতে হবে। আলেম ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়ার লোভ থেকে মুক্ত। নবীজী ﷺ একবার বাহিরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি কি ইহা চায় যে, আল্লাহ পাক তাকে শিক্ষক ছাড়া এলেম দান করুক, কারও দিক নির্দেশনা ছাড়া হেদায়াত দান করুক? তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে ইহা চায় যে, আল্লাহ পাক তাকে তার দীলের অন্ধত্ব দূর করে দিক, তার দীলের দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিক? যদি এই রূপ চাও, তাহলে শুনে রাখো, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত রাখে, আল্লাহ পাক তাকে শিক্ষা ছাড়া এলেম দান করেন এবং কারো দিক নির্দেশনা ছাড়া নিজেই হিদায়াত দান করেন।

অর্থাৎ যে নিজেকে দুনিয়ার লোভ ও আশা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে, সে এমন এক মাদরাসার ছাত্র হবে, যার উস্তাদ আল্লাহ পাক নিজে। আল্লাহ পাক নিজেই শিক্ষক এবং আল্লাহ পাক নিজেই হেদায়াত দানকারী, ঐ ব্যক্তির জন্য যার দীল দুনিয়ার নাপাকি থেকে পবিত্র। আল্লাহ পাক নিজে পবিত্র, আল্লাহ পাকের দেয়া দীন পবিত্র এবং এই দীনের জন্য

প্রয়োজন পবিত্র দীল। নিজেকে দুনিয়ার লোভ ও চাকচিক্য থেকে মুক্ত রাখি, আল্লাহ পাক এমন এলেম দান করবেন যা কিতাব অধ্যয়ন করার দ্বারা সম্ভব নয়। গুনাহ থেকে বাঁচি। নারীর ফেতনা, মোবাইল, ইন্টারনেট এগুলো তালিবুল ইলমের জন্য হারাম। যে তালিবুল ইলম মোবাইল টিপে মজা পায়, সারাদিন ফেইসবুক নিয়ে পড়ে থাকতে মজা পায়, সে কুরআন হাদীসের মজা থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে আল্লাহ পাক সে 'সাকীনা' নামক প্রশান্তি নাযিল করেন, সে এ থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। তাই টেকনোলজি থেকে দূরে থাক। দুনিয়াকে চিন। দুনিয়া ছাড়।

আর যদি দীল দুনিয়ার লোভ থেকে পবিত্র না হয়, তাহলে গুনাহ থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না, যতই তোমার কুরআন হাদীস মুখস্থ থাকুক না কেনো, যতই তুমি ওয়াজ-নসীহত করে বেরাও না কেনো। এই কুরআন হাদীস মুখস্থ করা তোমাকে কিয়ামতের দিন বাঁচাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিজের জীবনের আমলে না আসবে। এক হাদীসে নবীজী ﷺ এরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। সে সেই আগুনে তার নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন কিনা গাধা (গম পিষার) জাতার চারিদিকে ঘুরে। জাহান্নামের অধিবাসীরা এসে তাকে বলবে, হে অমুক, তোমার এই অবস্থা কেনো হলো? তুমিই কি আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করতে না এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতে না? তখন সেই ব্যক্তি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই সেই মন্দ কাজ করতাম।

আজ কাফেররা আমাদের উপর চড়াও হয়ে আছে, কারণ আমরা প্রকৃত ইসলামকে ধ্বংস করেছি। আমরা নবীওয়ালা ইসলামের জন্য কোনো কাজ করছি না বিধায় আল্লাহ পাক আমাদের সাহায্য করছেন না। তাই তোমাদের কাছে আমার আকুল আরজী, তোমরা "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী: গরীব ইসলাম" কিতাবটি মনোযোগ দিয়ে মুতালাআ কর, বুঝার চেষ্টা কর আমি তোমাদেরকে কী বুঝাতে চেষ্টা করেছি, সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা কর, উম্মতের কাছে এই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দাও।

আর সাবধান! তোমরা কখনো হীনমন্যতায় ভোগো না; আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এমন এক নিয়ামত- "ইলমে ওহী তথা কুরআন ও হাদীসের ইলম" দিয়েছেন, যা আর কাউকে দেননি। তোমরা হলে উম্মতের রাজপুত্র; আল্লাহ পাকের খাছ পরিবারভুক্ত লোক। বিশ্বাস কর, 'নাদান ও না-চীয' মাহমুদ আল হিন্দী তোমাদেরকে জীবন দিয়ে মহব্বত করে। আমাকে তোমরা ভুল বুঝ না। উলামায়ে কেরামের জুতার ধুলা মাহমুদের মাথায় না লাগলে, আজ সে হিম্মত করে এত কথা বলতে পারতো না। তার কলম এমন ক্ষুরধার লেখনী লিখতে পারতো না। আমার পিছনে অবশ্যই সেই সকল হক্কানী উলামায়ে কেরামের দুআ বর্তমান রয়েছে, যারা আমাকে মহব্বত করে এবং আমিও তাদেরকে মহব্বত করি। তাদের নেক নযরই আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আল্লাহ পাক উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমীন।

ওহে মাদরাসার ত্বলীবুল ইলম ভাইয়েরা!

মনে রেখ, সম্মান ও ইয্যতের মুকুট তোমাদেরই আছে, তোমাদেরই থাকবে, সন্দেহ নেই। তার আগে, তোমাদেরকে তোমাদের নবীর যিন্দেগীর অনুসরণ করতে হবে; তাহলেই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে চমকে দিবেন। আর নাহলে, তোমরাই হবে আল্লাহর কাছে আসমানের নীচে, যমিনের উপর সবচেয়ে অপ্রিয় বান্দা, 'মহা নিয়ামতের' না-শোকরগোজার বান্দা।

আল্লাহ পাক উম্মতের সকলকে সকল প্রকারের ক্ষতি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

আজ আমরা কুরআন ছেড়ে দিয়েছি, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর কথা আমরা ভুলে গিয়েছি, কেননা আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীই হচ্ছে কুরআন।

আর এ কারণে, অভিশপ্ত পশ্চিমাদের সংস্কৃতির ভূত উম্মতের উপর চেপে বসেছে। আজ তাদের মতো আমরাও দুনিয়াকে সাজানো, দুনিয়াকে মজবুত করা, আর বস্তুবাদের মধ্যে পার্থিব সার্থকতা তো খুঁজছি-ই, আরো খারাপ কথা হলো, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আমরা দুনিয়াবী উন্নতিকে মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করছি। যার ফলে, দুনিয়ায় মত্ত হয়ে কাপুরুষতার যিন্দেগী যাপন করছে।

তাই এখন সময় এসেছে নতুন করে ভাববার। যিন্দেগীকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার: নবীওয়ালা রঙে, সাহাবাওয়ালা সুরতে। তাহলেই আসবে আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয়।...........

প্রকৃত ইমাম মাহদী

যাচাইয়ে করণীয়....

ইমাম মাহদী চিহ্নিত করণের মাপকাঠি (প্রকৃত ইমাম মাহদী যাচাইয়ে করণীয়):

কেউ নিজেকে বা অন্যকে 'ইমাম মাহদী' দাবী করলেই সে ইমাম মাহদী হয়ে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিম্নে বর্ণিত মাপকাঠি দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন-

১. হাদীসে বর্ণিত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের প্রকাশের পূর্বের সকল আলামতসমূহ প্রকাশ পেতে হবে। যথা:

ক. সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃত ভবিষ্যৎ বাণীসমূহ সমাজে বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন: অধিকহারে সংঘাত ও হত্যাযজ্ঞ, স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন নারীদের আত্মপ্রকাশ, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি, মেয়েদের সাথে মেলামেশা বৈধজ্ঞান, যিনা/ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ, মদ্য এবং গান-বাজনা বৈধজ্ঞান ইত্যাদি।

খ. ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম- এর আগমনের সময় বিশ্ব পরিস্থিতি কেমন হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীসমূহ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন: খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্তান) হতে কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আত্মপ্রকাশ, অনারবদের পক্ষ থেকে ইরাকের 'দিরহাম' (অর্থনৈতিক) ও 'কাফিজ' (তৈল এর উপর) অবরোধ আরোপ, পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে সিরিয়ার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ, ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে সোনার পাহাড় বের হওয়া, ইরাকযুদ্ধ, সিরিয়ায় দুই সুফিয়ানির ফেতনা প্রকাশ, সিরিয়ায় যুদ্ধ ইত্যাদি।

গ. ইমাম মাহ্দীর প্রকাশের বছর যে যে আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার কথা সেগুলো প্রকাশ পেতে হবে। যেমন: মধ্য রমজানে (১৫ ই রমজান শুক্রবার রাতে) আকাশ হতে বিকট আওয়াজ আসবে, তিন রাজপুত্র কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই করতে থাকবে, মিনায় মহাযুদ্ধ সংগঠিত হবে ইত্যাদি।

[উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিষয়ে আমার লিখিত **"মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতিশ্রুত রাহ্‌বারের আগমন: ২০২০ সাল-ই কি সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ?"** কিতাবটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

২. হাদীসে বর্ণিত ইমাম মাহদী আলাইহিস্‌ সালামের পরিচয় তাঁর মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে। **যেমন:** নাম- আল্লাহর রাসূলের ﷺ নাম বা নামের মত, পিতার নাম- আল্লাহর রাসূলের ﷺ পিতার নাম বা নামের মতো, তিনি আহলে বাইত হবেন (হযরত ফাতিমা রদিয়াল্লহু আনহার বংশধারার হবেন এবং হযরত হাসান বিন আলী রদিয়াল্লহু আনহুমার সাথে গিয়ে মিলবে), ৪০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করবেন, পূর্বদিক থেকে আগমন করবেন, মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন, রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত নিবেন ইত্যাদি।

৩. হাদীসে বর্ণিত ইমাম মাহদী আলাইহিস্‌ সালাম- এর দৈহিক বর্ণনার সাথে পুরোপুরি মিল থাকতে হবে।

যেমন: "ফর্সা, দেহ মধ্যম গড়নের, সুঠাম । প্রশস্ত ললাট, সরু নাক, মুখে তিলক থাকবে। চোখের ভ্রূ, চোখের পাতি কুচকুচে কালো হবে। লম্বা, ঘন দাড়ি, যা বুক ঢেকে ফেলে, সামনের দাঁড়ি বেশি ঘন হবে।

উপরের দুই দাঁতে ফাঁকা থাকবে। পিঠে মোহরে নবুওয়তের মত চিহ্ন বিদ্যমান থাকতে হবে।

৪. প্রকৃত ইমাম মাহদী কখনো মাহদীত্বের দাবী করবেন না। বায়আতের জন্য মানুষকে ডাকবেন না। বরং মানুষ তাকে খুঁজে বের করে জোরপূর্বক বায়আত নেবে।

[উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিষয়ে আমার লিখা দ্বিতীয় কিতাব **"প্রতিশ্রুত রাহবারের সন্ধানে"** কিতাবটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

৫. আমাদের আলোচ্য বর্তমান কিতাবে (আমার লিখা তৃতীয় কিতাব **"নবীওয়ালা/সাহাবাওয়া যিন্দেগীঃ গরীব ইসলাম"**) এই পর্যন্ত যা আলোচনা হলো, সেই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারিঃ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আখলাক (চরিত্র) ও যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের ﷺ আখলাক ও যিন্দেগীর মতো হবে, (কিন্তু তাঁর চেহারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ চেহারার মতো হবে না)। নবীজী ﷺ যেমন দুনিয়াত্যাগী ছিলেন, নাপাক দুনিয়া হতে পাক ছিলেন, তেমনি ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামও দুনিয়া হতে পাক হবেন। তাঁর দীলের মাঝে গাইরুল্লাহর কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ তাআলার দ্বীন কায়েমের জন্য নিজের জীবন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। নিজের স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজনের মহব্বতকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার জন্য কুরবানী করবেন, হিজরত করবেন। দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য, খ্যাতি, ক্ষমতা ইত্যাদির লোভ করবেন না, বরং উম্মতের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিবেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আল্লাহর রাসূলের

ﷺ মতো অল্প পানাহারে তুষ্ট থাকবেন, দুই/তিনদিন পর পর পানাহারে অভ্যস্ত থাকবেন। এক বা দুই সেট সাদা কাপড়ে যিন্দেগী পার করবেন, ফলে তাঁর কাপড় হবে পুরাতন ও মলিন। দামী জুতা ব্যবহার করবেন না যেমনটি আল্লাহর রাসূল ﷺ করেননি, আল্লাহর রাসূলের ﷺ মতো হাতে লাঠি ব্যবহার করতে পারেন। ইমাম মাহদীর ঘর হবে আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘরের মতো। তাঁর ঘরে খাট-পালঙ্ক, সোফা, ফ্রিজ, এসি, ড্রেসিং টেবিল, সোকেইস্ ইত্যাদি থাকবে না। ঘরের মেঝে বা চাটাই হবে তাঁর বিছানা। তাঁর এই পরিমাণ সম্পদ থাকবে না যার কারণে তাঁর উপর যাকাত ফরয হবে, কেননা তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মতো মিসকীন বা দরিদ্র জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পর যেমন কোনো পেশায় নিয়োজিত ছিলেন না, পরিবারের জন্য রুটি-রুজি আয়ের উৎস ছিলো- আল্লাহর উপর ভরসা করা, উম্মতের পক্ষ হতে হাদিয়া এবং তরবারি (গণিমতের মাল), ঠিক তেমনি ইমাম মাহদীও এরকম হবেন। ইবাদতের ক্ষেত্রেও তিনি আল্লাহর রাসূলের পুরোপুরি অনুসারী হবেন। যেমনঃ তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ রাকাতে তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালা হবেন, দীর্ঘ রুকু সিজদার কারণে তার কপালে সিজদার চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করনেওয়ালা হবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক মহব্বত করনেওয়ালা হবেন।

৬. ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যে সকল আধ্যাত্মিক গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সেগুলো তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমনঃ ‘মাহদী’ শব্দের অর্থই হচ্ছে ‘আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সরাসরি পথ প্রদর্শিত।’

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম যেহেতু রাসূল নন, একজন সাধারণ উম্মত, আহলে বাইত, ন্যায়পরায়ণ বাদশা হবেন, সেহেতু তাঁর উপর তো ওহী নাযিল হবে না, বরং তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হবে 'স্বপ্ন'। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "মুমিনের নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (বুখারী-৬৫৮৭, মুসলিম-৫৬২২)। তিনি ﷺ আরও ইরশাদ করেন, "নবুয়তের কোন কিছুই বাকী নেই, কেবল মুবাশ্‌শিরাত ব্যতীত। নবীজী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মুবাশ্‌শিরাত কী?" তখন তিনি বললেন, "সত্য নেক স্বপ্ন যা মুমিনকে সুসংবাদ প্রদান করে।" (বুখারী-৬৫৮৯)। তাছাড়া ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম আহলে কাশ্‌ফ ও আহলে এল্‌হাম হবেন। তিনি কুরআন কারীম হতে সরাসরি দিক নির্দেশনা পাবেন। কেননা কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, "এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, এটি পথ প্রদর্শনকারী মুমিনদের জন্য।" (সূরা বাকারা ২:২)

যিনি ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম হবেন, উপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় তাঁর সাথে মিলতে হবে। যদি এক বা একাধিক আলামত অনুপস্থিত থাকে তাহলে তিনি "ইমাম মাহ্‌দী" নন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হক ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী বানিয়ে দিন। আমীন।

বার্তাঃ

অমুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি বার্তা...

অমুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি বার্তা

সালাম তাদের প্রতি যারা সত্য ও সঠিক পথ অনুসরণ করে।

অতঃপর-

আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি ফেরেশতাদের (Angels) নূর (আলো) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাজের জন্য। তাঁদেরকে রোবটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, তাঁরা কেবল আদেশ বাস্তবায়ন করে। এরপর আল্লাহ তাআলা জ্বীনদেরকে (Demons) সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলার আদেশ দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। তারা পৃথিবীতে একটি দীর্ঘ সময় বাস করে, এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে যায়। তারা নিজেদের মাঝে অনেক রক্তপাত ঘটায়। আল্লাহ তাআলা এদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য একদল ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতাগণ তাদেরকে ভূমি থেকে তাড়িয়ে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেন। এই জ্বীনদের মাঝে একজন ছিল, যার নাম হলো ইবলিশ। সে আল্লাহ তাআলার অনেক ইবাদত-বন্দেগী করত। ফেরেশতাগণ এদেরকে সাথে করে আকাশে নিয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা আদম (Adam)-কে (পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব) মাটি থেকে এবং হাওয়া (Eve)-কে (পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানবী) আদমের বুকের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছানুসারে আদমকে আকাশ এবং পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন। এরপর তার জ্ঞানের কারণে তাকে (আদমকে) সম্মানার্থে সকল ফেরেশতা এবং

ইবলিশকে সেজদা করতে নির্দেশ দেন। তাই সকল ফেরেশতারা আদমকে সম্মান প্রদর্শন করলো। কিন্তু ইবলিশ আদমকে সম্মান করতে অস্বীকার করল। সে আল্লাহ তাআলাকে বলল, আমি আদম অপেক্ষা উত্তম, কেননা তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর আদমকে মাটি থেকে। সুতরাং আল্লাহ পাক ইবলিশকে অভিশপ্ত করে দিলেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। ইবলিশ বলল, হে আল্লাহ, আমি অনেক বছর তোমার উপাসনা করেছি। আমার এই উপাসনার প্রতিদান কী? আল্লাহ তাআলা বললেন, তোর যা ইচ্ছা আমার কাছে চাইতে পারিস, আমি তোর ইচ্ছাকে পূরণ করবো। ইবলিশ বলল, হে আল্লাহ! আমার জীবনকে তুমি কিয়ামত দিবস (মহাপ্রলয়ের দিন, যেদিন আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হবে, সেদিন) পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করে দাও এবং আমাকে এমন ক্ষমতা দাও যেন আমি আদম ও তার বংশধরদের মনে কুমন্ত্রণা দিতে পারি। আজ আমি যে আদমের জন্য অভিশপ্ত হলাম, সেই আদম এবং তার সন্তানদের আমি পথভ্রষ্ট করতে চাই। আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছাগুলোকে মঞ্জুর করলেন এবং তাকে জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তুই শয়তান। আদম এবং তার সন্তানরা যদি আমার দেখানো পথ মেনে চলে তাহলে তুই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারবি না। আর যদি তারা তোকে অনুসরণ করে তাহলে তাদেরকে বিচার দিবসে জাহান্নামের (নরক) আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর তারা যদি তোর প্ররোচনার কারণে কোনো গুনাহ করে ফেলে, আবার অনুতপ্ত হয় এবং আমার কাছে মাফ চায়, তাহলে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব।

এরপর আদম এবং হাওয়া জান্নাতে (স্বর্গ) বাস করছিল। আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন, তোমরা এখানে বাস কর, যা ইচ্ছা হয় খাও, কিন্তু ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। এটি ছিল আদমের প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশনা। তাই শয়তান সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল খাওয়ার জন্য আদম ও হাওয়াকে প্ররোচিত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং তারা সে বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলে। এ কারণে আল্লাহ পাক তাদের উভয়কে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন, আদমকে শ্রীলঙ্কা এবং হাওয়াকে জর্ডানে। তারা উভয়ে অনুতপ্ত হলো এবং একে অন্যকে খুঁজতে লাগল। আল্লাহ পাক তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। ৩২৫ বছর পর মক্কার নিকটবর্তী "জাবালে রহমত" নামক একটি পাহাড়ে তারা একে অন্যের সাক্ষাৎ লাভ করে। আদম আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! দয়া করে মুহাম্মাদের উসীলায় আমাদেরকে মাফ করে দিন। আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন, তারপরেও আদমের মুখে শুনার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মুহাম্মাদ সম্পর্কে কিভাবে জানলে? আদম বললেন, আমি জান্নাতের দরজায় একটি বাক্য লিখা দেখেছিলাম, "আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তার রাসূল।" তাই আমি বুঝে নিয়েছি, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই এমন কেউ হবেন যিনি আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। আমার সকল সৃষ্টির মধ্যে মুহাম্মাদ সবচেয়ে প্রিয় আর আমি তাকে তোমার সন্তানদের মাঝে প্রেরণ করবো। আমি সমগ্র মহাবিশ্বকে তার জন্য সৃষ্টি করেছি। যেহেতু তুমি তার নামের দ্বারা আমার কাছে মাফ চেয়েছো, যাও আজকে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। আজকে থেকে তোমাকে এবং তোমার মাধ্যমে সকল মানবজাতির কাছে আমার চারটি নির্দেশনা প্রদান করছি।

প্রথমত, পৃথিবীতে তোমাদেরকে একটি জীবন দেয়া হবে, যা শেষ হবে মৃত্যুর মাধ্যমে, যেই সময়টি আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না এবং পৃথিবীর বস্তু-সামগ্রী থেকেই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে তোমরা উত্থান-পতন, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে। আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা করব।

তৃতীয়ত, আমি মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করতে আসমানী গ্রন্থ নাযিল করবো।

চতুর্থত, যারা আমার প্রেরিত গ্রন্থসমূহের অনুসারী হবে তারা মৃত্যুর পর (পরকালে) সফল হবে, তাদেরকে আমি পুরস্কৃত করবো। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিবো।

এরপর আদম এবং হাওয়া পারিবারিক জীবন-যাপন করতে লাগল। তাদের অনেক সন্তান হয়েছিল। প্রত্যেক বারই জোড়ায় জোড়ায় (একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে) সন্তান হতো। মানব জাতির বংশ বিস্তারের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি নিয়ম করে দিলেন যে, এক জোড়ার ছেলের সাথে অন্য জোড়ার মেয়ের বিবাহ দিতে হবে। এভাবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকল, নানান পরিস্থিতির উদ্ভব হতে লাগল, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পথ নির্দেশনাও আসতে লাগল। আদমকে যে ধর্ম দেয়া হয়, তার নাম ইসলাম। শয়তান তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করতে লাগল এবং নতুন নতুন অন্যায় এবং পাপের সূত্রপাত হতে লাগল। আদম নবীর অনেক সন্তান ছিল, এদের মধ্যে দুই ছেলে ছিল হাবিল ও কাবিল। কাবিল তার বিয়েকে কেন্দ্র করে তারই ভাই হাবিলকে হত্যা করে, আর এরই মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম রক্তপাত ঘটানোর সূত্রপাত

করে। শয়তান এই কাবিলের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়।

পর্যায়ক্রমে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে থাকে, গ্রাম ও শহর গড়ে তুলে। এভাবে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হতে থাকে। আর আল্লাহ পাক প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন ব্যক্তিকে ঐ জাতির জন্য পথপ্রদর্শক (রাসূল/বার্তাবাহক) হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁদের অনেককে আসমানী গ্রন্থ (কিতাব) দেয়া হয়। তবে অধিকাংশই এমন ছিলেন যে তাঁরা পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের বিধানাবলি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতেন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হতো না তাদেরকে আমরা ‘নবী’ বলি। যাদেরকে কিতাব দেয়া হতো, তাদেরকে আমরা ‘রাসূল’ বলি। অর্থাৎ সকল রাসূলকে ‘নবী’ বলা যায়, কিন্তু সকল নবী ‘রাসূল’ ছিলেন না। এরকম নবী-রাসূলের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এবং নাযিলকৃত (অবতীর্ণ) আসমানী গ্রন্থের সংখ্যা একশত চারখানা। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যে জাতির প্রতি এক বা একাধিক নবী/রাসূল (বার্তাবাহক) প্রেরিত হননি। আর এই নবী-রাসূলগণও সে জাতির মধ্য থেকেই হতেন, সাধারণত তারা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন।

সকল কিতাবের মধ্যে চারটি প্রধান, যেগুলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ চারজন রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়। তাওরাত মূসা নবীর উপর, যাবুর দাউদ নবীর উপর, ইঞ্জিল ঈসা নবীর উপর এবং সর্বশেষে কুরআন মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহিস্ সালামের উপর অবতীর্ণ হয়।

আগে মানুষ পৃথিবী সম্পর্কে বেশি কিছু জানতো না, তাদের পক্ষে সারা পৃথিবীর খোঁজ-খবর রাখা অসম্ভব ছিল। আর এ কারণে অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে যায়, সাথে সাথে তাদের কিতাবও। যাবুর কিতাবের অনুসারী ছোট্ট একটি জাতি এখনও ইরাকের কিছু অংশে বসবাসরত পাওয়া যায়। তাওরাতের অনুসারীরা প্রায় একুশশত বছর খাঁটি মুসলমান ছিল। এরপর তারা তাদের গ্রন্থ এবং সাথে সাথে তাদের ধর্মকে বিকৃত করতে লাগল। তারা তাদের নাম ‘মুসলমান’ বাদ দিয়ে ‘ইহুদী’ রাখল। এরপর ঈসা নবী অলৌকিকভাবে কুমারী মাতা মরিয়মের গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং তাঁকে ইঞ্জিল দেয়া হয়। তিনি যখন আল্লাহ পাকের সত্য বাণীসমূহ প্রচার করতে লাগলেন, এ শিক্ষা ইহুদীদের বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যায়। কিছু ইহুদী সত্যকে গ্রহণ করে নেয় এবং ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদী ঈসা নবী এবং তাঁর অনুসারীদের শত্রুতে পরিণত হলো। তারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের হত্যা করতে লাগল। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা ঈসা নবীকে হত্যা করবে। তারা যখন ঈসা নবীকে হত্যা করতে আসল, আল্লাহ পাক তাঁকে আকাশে তুলে নেন এবং ইহুদীদের একজনের চেহারা ঈসা নবীর মতো করে দেন, ফলে তারা তাদের আপন লোককেই ঈসা নবী মনে করে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে ফেলে।

ঈসা নবীকে আকাশে তুলে নেবার পরও প্রায় তিনশ বছর মুসলমানরা ইঞ্জিল শরীফের যথাযথ অনুসরণ করে আসছিল। এরপর ইহুদীরা অনেক মুসলমানকে হত্যা করে, আসল কিতাব পুড়ে ফেলে, কিছু ইহুদী মুসলিম সেজে প্রকৃত ঈঞ্জিলের বিকৃতি সাধন করে এবং বিকৃত কিতাব প্রচার করতে

থাকে। এভাবে পৃথিবীতে এক নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে যার নাম খ্রিস্টান ধর্ম, যেখানে ঈসা নবীকে প্রভু/স্রষ্টার মর্যাদা দেয়া হয়।

সর্বশেষে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ঘটে। তিনি পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণ যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তিনিও সেই একই আল্লাহর পক্ষ থেকে বানী মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' নিয়ে আবির্ভূত হন। তবে এবার আর নির্দিষ্ট কোনো জাতি কিংবা সময়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এমন এক আসমানী গ্রন্থ তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়। তিনি আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ রাসূল। কিয়ামতের আগে তাঁর পর আর কোনো নবী-রাসূল আগমন করবেন না। এজন্য তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সকল যুগের, সকল মানুষের জন্য উপযোগী করে নাযিল করা হয়েছে। আরেকটি কারণ এই যে, পৃথিবীর শেষ সময়ে মানুষ বিশ্বকে উদ্ঘাটন করবে, যোগাযোগের উন্নতি হবে, ফলে খুব সহজেই সারা বিশ্ব মানুষের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে।

আবার, যেহেতু রাসূল মুহাম্মাদের পর আর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না, তাই আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজেই এই গ্রন্থকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করবেন। কেউ কোনোদিন একে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, কোনোকিছুই করতে পারবে না। যেমন তিনি কুরআনে এ বাণী অবতীর্ণ করেছেন, "নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণ করব।" [সূরা হিজর, সূরা (অধ্যায়) নং- ১৫, আয়াত (বাক্য) নং- ৯]

আরেক স্থানে তিনি বলেন, "তোমার প্রভুর (কুরআনের) বাণীসমূহে কোনো পরিবর্তন নেই, নিশ্চয়ই এটি এক মহাসাফল্য।" [সূরা ইউনূস, সূরা (অধ্যায়) নং- ১০, আয়াত (বাক্য) নং- ৬৪]

পূর্বের ১০৩ টি কিতাবের মতো কুরআন ইতিহাসে হারিয়ে যাবে না, বা কেউ এটিকে কখনো বিকৃত করতে পারবে না। আল্লাহ পাক এই কুরআনকে সারা বিশ্বের লক্ষ-কোটি মুসলমানের (হাফেযে কুরআনদের) অন্তরে সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন। এটি কি একটি অলৌকিক ঘটনা নয় যে, দশ-বার বছর বয়সেই লক্ষ-কোটি মুসলমান যাদের আরবী ভাষার কোনো জ্ঞান নেই, তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যকে হুবহু তাদের অন্তরে মুখস্থ করে রাখতে পারে?

প্রিয় অমুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আপনারা যদি আরবী ভাষা জানতেন কিংবা অক্ষরগুলোও বুঝতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, (মক্কা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত) ১৪০০ বছর আগে কুরআন যেরূপ ছিল, আপনার বাড়ির পাশের কোনো একজন মুসলমানের ঘরে রক্ষিত কোনো একটি কুরআনের কপি, কিংবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে যদি আপনি কুরআনের কোনো কপি সংগ্রহ করেন, তাহলে দেখবেন, তা সেই ১৪০০ বছরের আগের সেই কুরআনের মতোই হুবহু একই রকম, একটি বাক্য কিংবা শব্দও পরিবর্তিত হয়নি। মহা পবিত্র সত্ত্বা তিনি, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করেছেন!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর সকল আসমানী গ্রন্থসমূহে বিশেষতঃ কুরআনের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির জন্য কী বার্তা রয়েছে?

প্রথমত, আল্লাহ তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ এক এবং একমাত্র প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তিনি সকল শক্তির উৎস। তিনি নিজেই মহাবিশ্বের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর কোনো শুরু নেই, শেষও নেই, তিনি অনাদি, অনন্ত। তাঁর কোনো সন্তান নেই। তিনি কারো

সন্তান নন। তিনি কারো উপর কিংবা কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। বরং সকল সৃষ্টিজগত, আমরা সকলেই তাঁর উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তাআলা আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝের ও বাহিরের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আমরা যা কিছু দেখি কিংবা না দেখি, সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

মহাবিশ্বের সকল কিছুই তাঁর অসীম ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের হাত নড়া-চড়া করা, পা দিয়ে হাঁটা, চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শুনা, মুখ দিয়ে খাওয়া, মন দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, শরীরের ভিতরের অঙ্গসমূহের কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিষয় ইত্যাদি, সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, তাঁর কাজের জন্য কারো কোনো সাহায্য প্রয়োজন পড়ে না, তিনি যখন কোনো কিছুকে বলেন ‘হও’, তখনই তা হয়ে যায়। অন্যদিকে আমাদের সকল কাজকর্ম তার নিয়ন্ত্রণাধীন। যেমন: তিনি যদি চান আমার হাতের কাজ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারেন, আমার পায়ের চলার ক্ষমতা লোপ করে দিতে পারেন, আমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারেন, আমার হৃদপিণ্ড, ফুসফুস আর কিডনীর কাজ বন্ধ করে দিতে পারেন। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

তিনি আকাশকে স্তম্ভ ব্যতীত উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন, ভূমিকে পানির উপর ভাসমান করেছেন, পূর্ব দিক হতে সূর্যোদয় করেন, পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত করেন। তাঁর ক্ষমতাতেই নৌকাসমূহ পানিতে ভাসে, পাখি আকাশে উড়ে। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রন্থ আল-কুরআনে সহজ সহজ উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, এগুলো তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন।

❁ **দ্বিতীয়ত,** তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন, পূর্ববর্তী অনেক জাতি ছিল, যাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শন, কিতাব সহ নবী-রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা সে সকল নবী-রাসূলগণকে এবং আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। নূহ নবী ছিলেন সবচেয়ে প্রাচীন নবী-রাসূলদের মধ্যে একজন। তাঁর জাতি তাকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে বন্যা দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। একই রকমভাবে লূত, সালেহ, শুয়াইব, ইউনূস, হুদ এবং অন্যান্য অনেক নবী রাসূলদের যুগের অস্বীকারকারী, অবাধ্যদের কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

❁ তৃতীয়ত, পৃথিবীর জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সামনে মৃত্যুর পর দুটি ঘাঁটি রয়েছে, যেগুলো পেরিয়ে আমাদেরকে সর্বশেষ চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে 'মৃত্যু' কী? মৃত্যু হচ্ছে এই পৃথিবীর জগত হতে আল্লাহ পাকের অদৃশ্য জগতে যাওয়ার একটি বাহন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন সে সময় উপস্থিত হয়, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈলকে প্রেরণ করেন, তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা আমাদের দেহে বাস করি। তাই যখন আমরা আমাদের দেহ ত্যাগ করি, তখন অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করি। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমার দেহের একটি আঙুল কেটে যায়, আমি ব্যথা অনুভব করি। তার কারণ, আমি, আমার জীবন সেই আঙুলকে ত্যাগ করি। তাই এখন চিন্তা করুন, যখন আমি, আমার জীবন সমস্ত দেহকে ত্যাগ করবে, তখন কেমন ব্যথা অনুভব হবে! যখন আপনি একাকী থাকেন, ব্যথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা হতে যত

দূরে, মৃত্যুর সময় তার তত বেশি কষ্ট হবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি নির্দেশনা। মৃত্যুর ফেরেশতা একজন পাপী মুসলমান কিংবা ইসলামকে অস্বীকারকারী ব্যক্তির দেহ থেকে যখন প্রাণ বের করে তখন অত্যন্ত ভয়াবহ কষ্ট দিয়ে বের করেন, কিন্তু একজন ধার্মিক মুসলমানের প্রাণ যখন বের করেন তখন অনেক সহজভাবে তা সম্পন্ন করেন।

এরপর কবর, হয়তো তা জাহান্নামের একটি গর্ত, নতুবা জান্নাতের একটি বাগান। আমরা যা করি, তার প্রতিফলন ঘটবে কবরের জীবনে। পৃথিবীতের আমাদের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে হয়তো কবর আমাদের জন্য আগুন এবং সাপের ঘর হবে, এমনটি থাকবে যতদিন না পৃথিবী ধ্বংস হয়। নতুবা কবর একটি আরামদায়ক বাগান হবে, এটিও পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অবধি বর্তমান থাকবে। যাদের দেহ মাটিতে কবর দেয়া হয় না, বরং অন্যভাবে সৎকার করা হয়, যেমন পুড়িয়ে ফেলা হয়, পানিতে ডুবে যায়, পশু খেয়ে ফেলে ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তাদের আত্মাকেও কবরের জীবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও সে হয় আরামে থাকে, নয়তো আযাবে গ্রেপ্তার হয়।

এরপর একটি সময় এমন আসবে যখন আল্লাহ তাআলা এই আকাশ, পৃথিবী এবং তন্মধ্যকার সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিবেন, এটিই কিয়ামত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একটি মাঠ বানাবেন (যাকে হাশরের ময়দান বলা হয়), যেখানে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। আমাদের দেহগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করে তাতে আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হবে। সেই মাঠে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম থেকে শুরু করে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকল মানুষ

উপস্থিত থাকবে। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে একেক করে তাঁর সামনে দাঁড়াতে বলবেন। এরপর তিনি প্রত্যেককে তার সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ দেখাবেন, সে পৃথিবীতে যা যা করে এসেছে তা তাকে দেখানো হবে। একে 'আমলনামা' বলা হয়। আল্লাহ আমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রদর্শন করবেন, কিন্তু তিনি সকলের প্রতি অত্যন্ত ন্যায় বিচার করবেন। মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব নিবেন। যদি ভালো কাজ তার মন্দ কাজের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে সেই মন্দ কাজগুলোকে মাফ করে দেয়া হবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তার ভালো কাজগুলোর অনুপাতে পুরস্কৃত করা হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। ঠিক এমনিভাবে, যদি মন্দ কাজগুলো তার ভালো কাজের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, সে জাহান্নামে যাবে এবং তার মন্দ কাজ অনুপাতে শাস্তি ভোগ করার পর একদিন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর সে আর কোনোদিন জান্নাত থেকে বের হবে না, সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে। সে এবং তার পরিবারবর্গের মধ্যে যারা জান্নাতী হবে, তারা একসাথে বাস করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে, কুরআনকে জীবন বিধান হিসেবে এবং ইসলামকে আপন ধর্ম হিসেবে মানবে না, সে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করবে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তার পরিবারবর্গের সাথে তাকে মিলিত হতে দেয়া হবে না। সে একাকী অনন্তকাল আগুনে পুড়তে থাকবে। কেননা,

মহাগ্রন্থ কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই (বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" [সূরা আলে ইমরান, সূরা (অধ্যায়) নং- ০৩, আয়াত (বাক্য) নং- ১৯]

তিনি আরো বলেন, “তারা কি আল্লাহর ধর্মের (ইসলামের) পরিবর্তে অন্য ধর্ম খুঁজছে? আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।” [সূরা আলে ইমরান, সূরা (অধ্যায়) নং- ০৩, আয়াত (বাক্য) নং- ৮৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে (মৃত্যুর পর) সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে (অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে)।” [সূরা আলে ইমরান, সূরা (অধ্যায়) নং- ০৩, আয়াত (বাক্য) নং- ৮৫]

তিনি আরো বলেন, “যারা (ইসলামকে এবং মুসলমান হতে) অস্বীকার করেছে, আর অস্বীকারকারী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছে, (মৃত্যুর পর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য) তাদের ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলামকে সত্য বলে মেনে নেয়া’ (তাওবা) কখনোই গ্রহণ করা হবে না, যদিও সে (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে, যন্ত্রণাদায়ক আযাব! পক্ষান্তরে তাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আলে ইমরান, সূরা (অধ্যায়) নং- ০৩, আয়াত (বাক্য) নং- ৯১]

তিনি আরো ঘোষণা করেন, “আর যে লোক কুরআনকে অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে।” [সূরা বাকারা, সূরা (অধ্যায়) নং- ০২, আয়াত (বাক্য) নং- ৩৯]

“(মৃত্যুর পর) যেদিন আল্লাহ তাদেরকে (অমুসলিমদেরকে) ডেকে বলবেন, তোমরা আমার পরিবর্তে যাদের পূঁজা করতে, তারা (আজ) কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করেনা (আমরা সেই সব মিথ্যা প্রভুদেরকে

আজ অস্বীকার করছি। আজ কেবল আপনাকেই আমরা মেনে নিচ্ছি।) পূর্বে তারা (অমুসলিমরা) যাদের পূঁজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে। এবং তারা বুঝে নিবে যে, তাদের কোনো রেহাই-নিষ্কৃতি নেই। [সূরা হা মিম সিজদাহ, সূরা (অধ্যায়) নং- ৪১, আয়াত (বাক্য) নং- ৪৭, ৪৮]

"যেদিন তিনি (আল্লাহ) বলবেন: তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে (আমার সাথে অন্যান্য যাদের পূঁজা করতে), তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দিবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দিব একটি মৃত্যু গহ্বর। অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝে নিবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না।" [সূরা কাহফ, সূরা (অধ্যায়) নং- ১৮, আয়াত (বাক্য) নং- ৫২, ৫৩]

চতুর্থত, কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র জীবনবিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা। এমনকি প্রস্রাব-পায়খানা করা, গোসল করা, স্ত্রী সহবাস করার মতো বিষয়গুলো নিয়েও রয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নির্দেশনা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধানাবলি, যা অন্য কোনো ধর্ম, কিংবা তন্ত্র-মন্ত্রে নেই।

সুতরাং ধর্ম কেবল সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করাকেই বুঝায় না। আমাদের জীবন একটি পরীক্ষার হলের মতো। ধর্ম হচ্ছে সেই পরীক্ষায় সাফল্যের মাধ্যম। যারা ইসলাম নামক ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তারাই হবে একমাত্র সফলকাম।..........

সংক্ষিপ্তাকারে এই হলো ইসলাম।

দয়া করে খুব সতর্কতার সাথে ইসলাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন। নিজের শেষ পরিণতির ব্যাপারে ভয় করুন। আপনি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন। তাহলে এই পৃথিবীতেও শান্তি পাবেন, মৃত্যুর পর পরলোকেও শান্তি লাভ করবেন। ইসলাম আপনার জীবনের সকল অন্যায়-অপরাধ, গুনাহ মিটিয়ে দিবে, অর্থাৎ আপনি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে নিষ্পাপ হয়ে যাবেন।

যে সব ভাই/বোন নাস্তিক, তারাও নিজের জীবন এবং শেষ পরিণতি নিয়ে আরেকবার চিন্তা করি। বিশুদ্ধ মনে, সঠিক পথ প্রাপ্তির আশা নিয়ে, এভাবেই প্রার্থনা করি, ওহে আমার স্রষ্টা! তুমি যদি সত্যিই থেকে থাক, তাহলে আমাকে পথ প্রদর্শন কর। আমি যদি ধ্বংসের পথে থেকে থাকি, তাহলে আমাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাও।........

তাই আর দেরি না করি! মৃত্যু আসার আগেই মুসলমান হয়ে যাই। নাহলে ধ্বংস সুনিশ্চিত, সন্দেহ নেই।

দয়াকরে, আপনার অন্যান্য অমুসলিম ভাই-বোন-বন্ধুদের নিকটও আমার এই দাওয়াত পৌঁছে দিন।

প্রিয় অমুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আমরা যারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না, আমরা নিচের কথাগুলো একটু ভালোভাবে চিন্তা করি-

- যদি আপনার ধর্ম সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে, আর ইসলাম ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনি লাভবান আর আমরা (মুসলমানরা) ক্ষতিগ্রস্থ হবো, সন্দেহ নেই।
- যদি সত্যিকার অর্থেই মৃত্যুর পরে কোনো জীবন না থেকে থাকে, তাহলে তো আপনি বা আমি, কারোরই কোনো চিন্তা নেই। মৃত্যুর সাথে সাথেই আমরা শেষ হয়ে যাবো।
- আর যদি কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, সৃষ্টিকর্তার নিকট ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা মুসলমানরা মুক্তি পেয়ে যাবো, সেক্ষেত্রে আপনার অবস্থা তখন কী দাঁড়াবে, তা কি চিন্তা করেছেন? আপনি কি পারবেন জাহান্নামের সেই কঠিন আগুনে অনন্তকাল দগ্ধ হতে, কিংবা সেই আগুনে ধৈর্য্য ধারণ করতে, যার উত্তাপ হবে পৃথিবীর আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি?
- আপনি হয়তো ভাবছেন, বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়তে পারবো না। আচ্ছা চিন্তা করুন তো, আপনার বাপ-দাদা আগে, না আপনার স্রষ্টা আগে? আপনার বাবা-মা আপনাকে কষ্ট করে পেলেছেন বলে তাদেরকে ছাড়তে পারছেন না, তাদের মহব্বত ভুলতে পারছেন না, আর যে স্রষ্টা আপনাকে বাবা-মা দিলেন, আজীবন আপনার ও আপনার বাবা-মার ভরণপোষণ করলেন, আহার সৃষ্টি করলেন, আকাশ-পৃথিবী বানালেন, পৃথিবীকে

আপনার জন্য বাসযোগ্য করলেন, আপনার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বানালেন, আপনার দেহের প্রতিটি কোষকে (একশ ট্রিলিয়ন কোষকে) পাললেন, এরকম অসংখ্য অগণিত দান দ্বারা আপনাকে ধন্য করলেন, আপনি সেই স্রষ্টার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম 'ইসলাম'কে কেন আপনার ধর্ম হিসেবে কবুল করবেন না? কেন সেই স্রষ্টার উপর মা-বাবাকে প্রাধান্য দিবেন? আরো চিন্তা করুন, আপনার মৃত্যুর পর আপনার মা-বাবা কি আপনার সঙ্গী হবে? তারা কি আপনাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবে? পৃথিবীর ৫০-৬০ বছরের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য মৃত্যুর পর অনন্তকালের যিন্দেগীকে ধ্বংস করা কী কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হলো? ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে, আর আপনি যদি জ্ঞানী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য কি এটিই উচিত নয় যে, নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন, সকলেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন?

- ইসলামের সত্যতার জন্য কুরআনই কি যথেষ্ট নয়? কুরআন কি হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কর্তৃক রচিত? আরবের এই মহামানবের জীবন কি আপনাদের সামনে নেই? তাঁর জীবনী আপনারা কেন পড়েন না? পৃথিবীর ইতিহাস কি 'সকল দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ' অন্য কোনো মানুষ দেখেছে? আপনারা কি একটুও চিন্তা করবেন না? যে ব্যক্তি ছিল নিরক্ষর, তাঁর পক্ষে কি এমন বিজ্ঞানময় কুরআন রচনা করা সম্ভব ছিল? আল-কুরআনে "১৯" সংখ্যার যে অলৌকিক বিন্যাস রয়েছে, তা কি কোনো সৃষ্টির পক্ষে রচনা করা সম্ভব?

যখন অত্যাধুনিক কম্পিউটার রায় দিল, "কুরআন কারীমে যে সব নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা মানা হয়েছে, '১৯' সংখ্যার জটিল জালকে এঁটে দেয়া হয়েছে এর মধ্যে- তেমনিভাবে সমশব্দে সম বাক্যসংখ্যায় সমানসংখ্যক অক্ষরে একটি অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়ত ৬.২৬ $\times$ ১০^{২৬} বছর", তখন আপনি এটাকে কিভাবে অস্বীকার করবেন?

কত এর মান উল্লিখিত সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির? এর পরিমাপ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন এবং তা অনুধাবনের অনেক বাইরে। সংখ্যাগতভাবে এর প্রকাশ ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (৬২৬ এর পর ২৪ টি শূন্য)। বর্তমানে পৃথিবীর বয়স মাত্র ৪৫০,০০০০০০০ (৪৫০ কোটি) বৎসর। আমরা যদি আজকের দুনিয়ার ৫০০ কোটি মানুষকে পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই যামানার সকল প্রযুক্তি নিয়ে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ লেখার কাজে নিয়োজিত বলে ধরে নেই, তবে উক্ত কম্পিউটার লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মানুষ জাতির এই মহাসম্মিলন প্রসূত কাজের অগ্রগতির মান হবে ৪৫০,০০০০০০০ $\times$ ৫০০,০০০০০০০ = ২২৫ $\times$ ১০^{১৭} কর্ম বছর যা সেপ্টিলিয়ন সংখ্যাটির একশ কোটি ভাগের মাত্র ৩৫ ভাগের সমান, যা হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি নুড়ির মত তুল্য হবে। আর এ প্রকল্পের শর্ত হলো এই যে, প্রতিটি মানুষেরই আয়ুষ্কাল ৪৫০ কোটি বছর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই সময়ের মাঝে তারা অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা কত পবিত্র!!!

এককথায়, আল-কুরআনের এই অত্যাশ্চর্য সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জালটি অতি অভিনব, অতিশয় বিস্ময়কর এবং যে কোনো সৃষ্টির পক্ষে তা অনুকরণের ক্ষমতা বহির্ভূত।

(Miracle of 19 in Quran, Mathematical Miracles in the Quran, Scientific Miracles in the Quran, Unchangeable Miracles in the Quran) ইত্যাদি লিখে ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই এ সম্পর্কে অনেক তথ্য-উপাত্ত পাবেন।

প্রকৃতপক্ষে, আজকের কম্পিউটার শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করেছে, যেই চ্যালেঞ্জ মানবজাতিকে ছুড়ে দেয়া হয়েছিল ১৪০০ বছর পূর্বে-

"(হে মুহাম্মাদ) বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবুও তারা তা সম্ভব করতে পারবে না।" [সূরা বনী ইসরাঈল : সূরা (অধ্যায়) নং-১৭, আয়াত (বাক্য) নং- ৮৮]।

"বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়।" [সূরা কাহাফ: সূরা (অধ্যায়) নং-১৮, আয়াত (বাক্য) নং- ১০৯]

"এতদসম্পর্কে (কুরআন এবং ইসলাম সম্পর্কে) যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে কুরআনের মত একটি সূরা (অধ্যায়) রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও (তোমরা যেসব প্রভুর উপাসনা কর) সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তোমরা তা না পার- অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে (কুরআন ও

ইসলামে) অবিশ্বাসীদের জন্য।" [সূরা বাকারাঃ সূরা (অধ্যায়) নং-০২, আয়াত (বাক্য) নং- ২৩, ২৪]

প্রিয় অমুসলিম ভাই ও বোনেরা! এরপরও কি আপনারা চিন্তা-ভাবনা করবেন না?????

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। সত্য ধর্ম গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। দুনিয়া ও পরকালে মুক্তি দান করুন। আমীন।

- আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই, যারা সাধারণ অমুসলিম ভাই-বোন, যারা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না, মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন না, মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলন করেন না, ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা করেন না, বা এ কাজে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকে সহযোগিতা করেন না, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ান না, সেই সকল অমুসলিম ভাই-বোনদের সাথে আমরা মুসলমানরা কোনোরূপ শত্রুতা পোষণ করি না, তাদের রক্ত আমাদের জন্য হারাম, তাদের ধর্ম-কর্মে মুসলমানরা কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোনো মুসলমান যদি অনর্থক কোনো অমুসলমানকে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যাবে।"

মুসলমানরা যদি আপনাদের কোনো অঞ্চল জয় করে, তাহলে আপনারা যদি ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন,

সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের আপন ভাই-বোনদের চেয়েও বেশি আপন হবেন। কেননা আমরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের তুলনায় ধর্মের সম্পর্ককে বড় বিবেচনা করি। আর যদি আপনারা তা গ্রহণ না করেন, সেক্ষেত্রে মুসলিম প্রশাসনকে আপনাদের নামমাত্র কিছু 'কর' (Tax) দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। এর দ্বারা আপনাদেরই লাভ হবে বেশি। কেননা, আপনারাই আপনাদের দেশ পরিচালনা করবেন, কিন্তু কর দিয়ে আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন, আমাদের শত্রুদের সাথে হাত মিলাবেন না, বিনিময়ে আমরা আমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে আপনাদেরকে আপনাদের শত্রু হতে আপনাদের ধর্ম, মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু, ধন-সম্পদের হেফাযত করবো। আপনাদের নারীদের দিকে আমরা চোখ তুলে তাকাবোও না। তাকালে আমাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে। এটিই আল্লাহর হুকুম, এটিই ইসলামের বিধান। বলুন, পৃথিবীতে এমন আরো কোনো ধর্ম আছে কি? এইভাবে অন্য ধর্মের লোকদের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ইতিহাস পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে আছে কি?

আর যদি আপনারা তাতে সম্মত না হন, উল্টো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেন, সেক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু নিজেদের কল্যাণকামী হননি, তাই আমরা ধরে নিব, আপনারা আমাদের সাথে দুশমনী করতেই বেশি পছন্দ করেছেন। এক্ষেত্রে আপনারা আমাদের শত্রুতে পরিণত হবেন, তখন আমাদের উপর জিহাদ করা ফরয (বাধ্যতামূলক) হয়ে যায়। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সাথে লড়াই করবো, যতক্ষণ না আপনারা কিংবা আমরা একদল ধ্বংস হয়ে যাই এবং

আমাদের ভূমি এবং সকল ধন-সম্পদ যে কোনো একদলের অধিকারে চলে যায়, আর যে কোনো একদলের নারীরা অন্য দলের ভোগ্য দাসী-বাঁদীতে রূপান্তরিত না হয়ে যায়!

ইসলামের ইতিহাস দেখুন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে, সে সকল বিজিত অঞ্চলগুলোতে ইসলাম অমুসলিমদের সাথে কিরূপ উত্তম আচরণ করেছে, ন্যায়-ইনসাফের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, কিভাবে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, কিভাবে তারা তাদের ওয়াদা রক্ষা করেছে!

আবার এও দেখুন, যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদের শেষ পরিণতি কী হয়েছে?

কিয়ামত সন্নিকটবর্তী! শেষ যামানা চলছে। খুব শীঘ্রই মুসলমানদের প্রতিশ্রুত নেতা ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে, তাঁর দ্বারা সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই মিথ্যুক দাজ্জাল (মাসীহের মিথ্যা দাবীদার)-এর আবির্ভাব ঘটবে। সে নিজেকে মানবজাতির স্রষ্টা দাবী করবে। আল্লাহ পাক তাকে অলৌকিক কিছু ক্ষমতা দিবেন, যেমনঃ সে মৃতকে জীবিত করতে পারবে, আকাশকে হুকুম করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ভূমিকে হুকুম করলে ভূমিকম্প হবে। একমাত্র মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর সকল জাতিকে সে পথভ্রষ্ট করবে। সে দুই বছরের মতো থাকবে। সে এবং তার দলবল মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরপর তাকে হত্যা করার জন্য ঈসা নবী (সত্য মাসীহ্)-এর আগমন ঘটবে। তিনি তাকে হত্যা করবেন। সারা দুনিয়ায়

এক আল্লাহর আইন কায়েম করা হবে, এরপর পৃথিবীতে কোনো অমুসলিম থাকবে না। হয়ত সবাই মুসলমান হবে, নয়তো তাদেরকে হত্যা করা হবে; এরপর পৃথিবীতে আর কখনো যুদ্ধ হবে না; এমনই হবে। আল্লাহর সত্য নবী এমনি ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন। তাঁর কথা, তাঁর ভবিষ্যদ্বানীগুলো সম্পর্কে অবগত হোন। তাহলে বুঝবেন, তিনি কিভাবে পৃথিবীর শেষ সময়ের ঘটনা পরম্পরাগুলো অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে গিয়েছেন। যুগে যুগে কিভাবে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়ে আসছে! ভবিষ্যতেও হবে ইনশাআল্লাহ, সন্দেহ নেই। ইসলামের সত্যতার জন্য আর কী প্রমাণের দরকার আছে?

তাই আবারো বলছি, একটু চিন্তা করুন, ইসলাম সম্পর্কে জানুন, ঈমান আনুন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। শয়তানের ধোকা এবং পৃথিবীর চাকচিক্যের ধোকা যেন আপনাদেরকে প্রতারিত না করে। ইসলাম গ্রহণ করুন। আমরা আপনাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী!

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

অগ্নিস্ফূলিঙ্গ থেকে দাবানল

১৩০০ বছর পূর্বের কথা.......

হিন্দুস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের হিন্দু রাজা ছিল দাহির। সে কতিপয় মুসলিম নারী ও শিশু আটক করে যুলুম নির্যাতন করে। যার প্রেক্ষিতে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে জাত্যাভিমানী এক মুসলিম বোন হিন্দুস্তান থেকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে একটি শ্বেত রুমালের উপর এক ঐতিহাসিক চিঠি লিখেন; চিঠিটি লিখে তৎকালীন বসরার শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বরাবর প্রেরণ করেন। চিঠিটি ছিলো এই-

“দূতের মুখে মুসলমান শিশু ও নারীদের বিপদের কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বসরার শাসনকর্তা স্বীয় সৈন্য বাহিনীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৈনিককে অশ্ব প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। সংবাদ বাহককে আমার এ পত্র দেখাবার প্রয়োজন হবে না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রক্ত যদি শীতল হয়ে জমে গিয়ে থাকে তবে হয়তো আমার এই পত্রও বিফল হবে। আমি আবুল হাসানের কন্যা। আমি ও আমার ভাই এখনো শত্রুর নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের অন্য সমস্ত সঙ্গী এখন শত্রুর হাতে বন্দী- যাদের বিন্দুমাত্র দয়া নেই। বন্দীশালার সেই অন্ধকার কুঠুরীর কথা কল্পনা করুন- যেখানে বন্দীরা মুসলিম মুজাহিদের অশ্ব ক্ষুরের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ ও অস্থির হয়ে আছে। আমাদের জন্য অহরহ সন্ধান চলছে। সম্ভবতঃ অচিরেই আমাদেরকেও কোনো অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দী করা

হবে। এও সম্ভব যে, তার পূর্বেই আবার যখন আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিবে, আমি সে দূরদৃষ্ট হতে বেঁচে যাব। কিন্তু মরবার সময় আমার দুঃখ থেকে যাবে যে, যেসব ঝঞ্ঝা গতি অশ্ব তুর্কিস্তান ও আফ্রিকার দরযায় ঘা মারছে, স্বজাতির এতীম ও অসহায় শিশুদের সাহায্যের জন্য তারা পৌঁছতে পারল না! এও কি সম্ভব যে, তলোয়ার রোম ও ইরানের গর্বিত নরপতিদের মস্তকে বজ্ররূপে আপতিত হয়েছিল, সিন্ধুর উদ্ধত রাজার সামনে তা ভোঁতা প্রমাণিত হলো। আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা। কিন্তু হাজ্জাজ, তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আত্মমর্যাদাশীল জাতির এতীম ও বিধবাদের সাহায্যে ছুটে আস।"

-নাহীদ

আত্মাভিমানী জাতির এক অসহায়া কন্যা।

চিঠিটি পড়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খঞ্জর বের করে তার অগ্রভাগ সিন্ধুর মানচিত্রে বিদ্ধ করে বললেন- আমি সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। এ ঘোষণা দিয়ে তিনি পুরো যুদ্ধের দায়িত্বভার তার নব বিবাহিত জামাতা এবং ভাতিজা ১৭ বছরের ছেলে মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে দিলেন। এই চিঠির বার্তা পৌঁছে গেল প্রতিটি মুসলিম যুবকের দ্বারে দ্বারে। তাদের মাঝে জাগ্রত পৌরুষত্ব যেন বিস্ফোরিত হলো। মুসলমান এতীম শিশু ও নারীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনে, জাত্যাভিমানী মুসলিম যুবকেরা সেদিন ঘরে বসে থাকতে পারেনি, নববধূদের রেখেই ছুটেছিলেন জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে। শিশুদের ক্রন্দনের আওয়ায যার কাছেই পৌঁছেছে সেই ইসরাফিলের শিঙ্গার মতো গর্জে উঠেছে আর সিন্ধু রাজা ও তার বাহিনীর জন্য আযরাঈল হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম শিশু ও নারীদের উদ্ধার করলেন এবং বিজয় দিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনীকে প্রতিটি মুসলিম যুবকের জন্য দৃষ্টান্ত বানালেন, ইতিহাসে চির ভাস্বর করে রাখলেন।

১৩০০ বছর পর.......

ইরাকের আবূ-গারীব কারাগার থেকে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা 'আমার এক বোন' ফাতিমা নূরের চিঠিঃ

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"বল, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারো জাতও নন। তার সাথে তুলনীয় কোনো কিছুই হতে পারে না।" (আল-কুরআন, সূরা নং-১১২, "আল-ইখলাছ")

আমি আল্লাহ তাআলার মহাগ্রন্থ থেকে এই সূরা পছন্দ করেছি, কারণ এই সূরাটি আমার উপর এবং আপনাদের সকলের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ফেলে এবং সূরাটি একজন মুমিনের অন্তরে এক প্রকারের ভীতি সঞ্চার করে।

আল্লাহর রাহের আমার মুজাহিদীন ভায়েরা!

আমি আপনাদের আর কী বলব? আমি আপনাদের বলিঃ আমাদের গর্ভগুলো ঐসব বানর এবং শূয়োরের বাচ্চাদের সন্তান দ্বারা ভরে গেছে, যারা আমাদেরকে ধর্ষণ করেছে।

কিংবা আমি আপনাদের বলতে পারিঃ তারা আমাদের দেহকে বিকৃত করেছে, লাঞ্ছিত করেছে, আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে, এবং আমাদের গলায় ঝুলানো যে কুরআন ছিলো তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে।

আল্লাহু আকবার! আপনারা কি আমাদের অবস্থা অনুধাবন করতে পারছেন না? এটা কি সত্য, আমাদের উপর যা ঘটছে তা আপনারা জানেন না? আমরা কি আপনাদের বোন নই? আগামীকাল (কিয়ামতের দিন আমাদের ব্যাপারে) আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহর কসম! আমাদের উপর কারাগারে এমন একটি রাত অতিবাহিত হয়নি, যাতে এই বানর ও শূয়োরেরা আমাদেরকে বিবস্ত্র করে তাদের উদ্ধত কামনা চরিতার্থ করতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। আর আমরা ছিলাম সেই মুসলিম নারী, যারা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর ভয়ে সবসময় হেফাযত করে রাখতাম। আল্লাহকে ভয় করুন! তাদেরকে সহ আমাদেরকে হত্যা করুন। তাদেরকে সহ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিন! আমাদেরকে ধর্ষণ করে মজা লুটার জন্য তাদের হাতে আমাদেরকে ফেলে রাখবেন না। আপনাদের এই কাজে আরশের অধিপতি আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। বাহিরে তাদের কামান এবং ট্যাংকে আক্রমণ না করে আবু গারীব কারাগারে আমাদের কাছে আসুন।

আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, আমি আপনাদের বোন (ফাতিমা)। তারা একদিনে আমাকে নয় বারের বেশি ধর্ষণ করেছে। আপনারা কি (আমাদের অবস্থাটা) বুঝতে পারছেন?

আমার জায়গায় আপনার কোনো এক বোনকে কল্পনা করুন। কেন আপনারা সকলে তা ভাবতে পারছেন না, অথচ আমি আপনাদের একজন বোন? আমার সাথে আরো তেরজন মেয়ে আছে, তাদের সকলেই অবিবাহিত। তাদের সকলকে প্রত্যেকের চোখ এবং কানের সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে।

তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে দেয় না। তারা আমাদের দেহের পোশাক কেড়ে নিয়েছে, আমাদেরকে পরার জন্য কোনো কাপড় দেয় না। আমি যখন এই চিঠিটি লিখছি, তখন একজন বোন আত্মহত্যা করেছে। তাকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। একজন সৈন্য তাকে ধর্ষণ করার পর তার বুক এবং উরুতে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে। সৈন্যটি বোনটির উপর অবিশ্বাস্য রকম অত্যাচার করেছে। বোনটি কারাগারের দেয়ালে তার মাথা বার বার আঘাত করতে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যদিও ইসলামে আত্মহত্যা নিষেধ, আসলে বোনটি কোনোভাবেই আর সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু আমি সেই মেয়েটিকে মাফ করে দিয়েছি। আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলাও তাকে মাফ করে দিবেন, কেননা তিনি তো পরম করুণাময়, অতিশয় ক্ষমাশীল।

ভায়েরা আমার! আমি আপনাদেরকে আবারো বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন! তাদের সাথে আমাদেরকে হত্যা করুন, যেন আমরা শান্তি লাভ করি। আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদেরকে সাহায্য করুন! [ওয়া মু‘আতাসিমা!]

চিঠিটি এখানেই শেষ! কিন্তু যেই বোন এই চিঠিটি লিখেছেন এবং তার সাথে যারা ছিলেন, তাদের মতো বোনদের উপর ধর্ষণ ও নির্যাতন শেষ হয়নি। আমার মা ও বোনদের উপর ধর্ষণ ও নির্যাতন এখনো শেষ হয়নি, তা চলছে ফিলিস্তিনে, সিরিয়ায়, ইরাকে, চলছে আফগানিস্তানে, চীনে, ভারতে, কাশ্মীরে, চলছে মায়ানমারে, ...

কেন জানেন? কারণ, আমরা এখনো ঘরে বসে আছি! আমাদের মাঝে পৌরুষত্ব জাগ্রত হচ্ছে না! আমরা বোনের ডাকে ময়দানে ছুটে যাই নি! আমরা আল্লাহকে ভয় করছি না! জাহান্নামের আগুনকে ভয় করছি না! নিজের আরাম-আয়েশ আর ফূর্তির যিন্দেগী ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু আমাদের তকদীর হয়ে যায়! বোনদের চিৎকার ও আর্তনাদ আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু আমার, আপনার কর্ণকুহরে পৌঁছে না! তাইতো আল্লাহ তাআলা আহ্বান করছেন-

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً

“আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের

জন্য পক্ষালম্বনকারী অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

ওহে মুসলিম যুবকেরা!

ওহে ইসলামের সিংহপুরুষেরা!

ওহে আল্লাহর বাঘেরা!

ওহে আল্লাহর তরবারিরা!

জেগে ওঠো!

কিসের ভয়? কিসের পিছুটান?

প্রস্তুতি নাও মহা যুদ্ধের!

তোমাদের রক্ত কি খালিদ বিন ওয়ালিদের রক্ত নয়?

তোমাদের রক্ত কি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, মুসান্না, আমর ইবনুল আস, ইকরামার রক্ত নয়?

তোমাদের রক্ত কি জাবের, যায়েদ আর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার রক্ত নয়?

তোমরা কি মুআজ বিন জামূহ আর মুআজ বিন আফরাদের কথা ভুলে গিয়েছো? তোমরা কি তাদের সন্তান নও? (রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাইন)।

তোমাদের রক্ত কি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রক্ত নয়?

তোমাদের রক্ত কি সালাউদ্দিন আউয়ুবীর রক্ত নয়?

তোমাদের রক্ত কি নুরুদ্দিন জঙ্গীর রক্ত নয়?

তোমাদের শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে কি তারিক বিন যিয়াদ, ইউসুফ বিন তাশফিনের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না?

তোমরা কি ২১ বছর বয়সী কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদ আল ফাতিহ-র উত্তরসূরী নও?

তোমরা কি ১৭ বছর বয়সী সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মাদ বিন কাসিমের প্রজন্ম নও? (রাহিমাহুমুল্লাহু আযমাঈন)।

তোমরা কি একই মুসলিম জননীর দুগ্ধপানকারী সন্তান নও?

তোমাদের মায়ের দুধ কি খাঁটি ছিল না?

তোমাদের মায়ের দুধের ধার কি কমে গিয়েছে?

তোমাদের রক্ত কেন এমন হিম শীতল হয়ে গেল?

যে গর্ভ তোমাদের ধারণ করেছিল, তা কি হিমাগার ছিল?

নাকি তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত তোমাদের পিতার রক্ত সাদা হয়ে গিয়েছে?

তোমাদের রক্তের বারুদ কেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে না?

তোমাদের অন্তরে কেন প্রতিশোধের দাবানল সৃষ্টি হচ্ছে না?

তোমরা কি অপেক্ষা করছ, কুকুর আর শুয়োরেরা তোমার চোখের সামনে তোমার মা, বোন আর স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করবে, এরপর তুমি ময়দানে ঝাঁপ দিবে? তোমার সন্তানকে তোমার চোখের সামনে কেটে টুকরা টুকরা করবে, এরপর তুমি ময়দানে যাবে? তোমার পিতা আর ভাইকে হায়েনাগুলো আগুনে পুড়িয়ে মারবে, এরপর তুমি ময়দানে ঝাঁপ দিবে?

চেয়ে দেখো, খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের দিকে, তারা তাকিয়ে আছে, তোমার প্রাণপ্রিয়া সহধর্মিনীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে?

চেয়ে দেখো, হিন্দু ক্রুসেডারদের দিকে, তারা তাদের কাম-মত্ত পুরুষাঙ্গকে ধার দিচ্ছে তোমার মা আর বোনের জন্যে?

এই মাল্‌উন শয়তানদেরকে কি তুমি এমনি এমনি ছেড়ে দিবে? প্রতিশোধ নিবে না?

তোমাদের হৃদয়ে কেন অনুশোচনার ঝড় বইছে না?

আর কতদিন নারীত্বের মালা পরে ঘরে বসে থাকবে?

আর কতদিন হাতে চুড়ি, মাথায় ঘোমটা পরে ঘরে বসে থাকবে?

কাপুরুষের যিন্দেগী আর কতদিন?

ইঁদুরের মতো হাজার বছর বাঁচার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বাঁচা কি উত্তম নয়?

তোমাদের যৌবনের জৌলুস কি শেষ হয়ে গেছে? তোমাদের বীর্য কি শুকিয়ে গেছে? তোমাদের শুক্রাণুগুলো কি স্থবির হয়ে গেছে?

আল্লাহ তাআলা বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন 'চার' পর্যন্ত, কিন্তু দাসী-বাদী? এর কি কোনো সীমা আছে? তুমি কত জন চাও? আল্লাহ তাআলা কি তোমার জন্য তা হালাল করেননি?

তুমি কি সুন্দরী হিন্দু নারীদের দাসী-বাদী হিসেবে পেতে চাও না?

তুমি কি সুন্দরী খ্রিস্টান নারীদের দাসী-বাদী হিসেবে পেতে চাও না?

তুমি কি সুন্দরী বৌদ্ধ নারীদের দাসী-বাদী হিসেবে পেতে চাও না?

তুমি কি সুন্দরী ইহুদী নারীদের দাসী-বাদী হিসেবে পেতে চাও না?

বার্ধক্য কি তোমাদেরকে জরাগ্রস্ত করে ফেলেছে?

তোমরা কি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ? আরে শাহাদাত তো মৃত্যু নয়, চির জীবন! অনন্ত কাল বেঁচে থাকার নাম! তাতো জীবিত থাকার চেয়ে আরো উত্তম! আরো উত্তম!

চেয়ে দেখ! কত মানুষ বাতিল ধর্ম ও মতবাদের জন্য, ত্বগুতের জন্য আপন জীবন দিয়ে দিচ্ছে। হায়! তোমরা সত্যের অনুসারী হয়েও মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ?

তোমরা কি সুউচ্চ জান্নাতের কথা ভুলে গেছ? তোমরা কি মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতী হূরের সাক্ষাৎ চাও না? তোমরা কি হূরে ঈন, হূরে লূ'বাদের কথা ভুলে গেছ? তাদের সাথে মিলনের আনন্দের কথা কি ভুলে গেছ? কি, তাদের ডাক কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?

দুনিয়ার এসব নারী আর দাসী-বাদীদের পিছে পড়ে কী লাভ, বল?

প্রিয় প্রভু আল্লাহ তাআলার দীদারের কথা কি তোমরা ভুলে গেছো? তার মহাসন্তুষ্টির কথা? তাঁর দীদার-সুখের সামনে অন্য কোনো সুখের তুলনা চলে কি?

আর ঘুম নয়, এবার জেগে উঠার পালা,

এবার প্রতিশোধ নেবার পালা,

এবার দেনা পরিশোধের পালা,

এবার রণসাজে সজ্জিত হয়ে মরুসিংহের ন্যায় গর্জে উঠার পালা,

তোমার আওয়ায যেনো হয় ইসরাফিলের শিঙা,

তোমার রণহুংকারে বাতিলের শিবিরে শুরু হোক কিয়ামতের বিভীষিকা!

এবার ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা,

তোমাকে হতে হবে বাতিলের যম, আযরাঈলের থাবা,

জীবরাঈলের বাহুবল, কালবৈশাখীর বজ্রপাত।

তোমাকে হতে হবে টর্নেডো, সাইক্লোন, আগ্নেয়গিরি, লাভাময় অগ্নুৎপাত!

এবার মুসলমানদের প্রতিটি রক্তের ফোটার প্রতিশোধ নেবার পালা,

প্রতিটি মা-বোনের হত ইজ্জত-সম্ভ্রমের বদলা নেবার পালা,

এক হাতে লও কুরআন, আরেক হাতে মেশিনগান,

এবার তাকবীরে তাকবীরে আসমান-যমীন প্রকম্পিত করার পালা,

“না’রায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার!

না’রায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার!

না’রায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার!”

বজ্রনাদ

ওহে বাতিল শক্তি! ওহে আমেরিকা ও তার দালালেরা! ওহে ইহুদীরা! ওহে খ্রিস্টানরা! ওহে হিন্দু আর বৌদ্ধরা! ওহে নাস্তিক-মুরতাদরা! ওহে মুনাফিকের দলেরা!

সময় থাকতে তোমরা ঈমান আনো। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নাও। শয়তানের উপাসনা করো না, এক আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও আমাদের প্রতিপালক, আসমান-যমীন, তার মধ্যবর্তী ও তার বাহিরের সকল কিছুর প্রতিপালক এবং তোমরা যার উপাসনা কর তাদেরও প্রতিপালক। নাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্বে সাহাবাদের জামাতের মতো এমন এক জামাতকে প্রস্তুত করছেন, তোমাদেরকে সহ এই যামানার সমস্ত বাতিল শক্তিকে জিন্দা অথবা মুর্দা দাফন করার জন্য, তোমাদের সমস্ত শক্তি মিলে তাদের গায়ের একটি পশমও ছিড়তে পারবে না। কেননা তাদের সাথে রয়েছে সকল শক্তির সৃষ্টিকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

ওহে মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলনকারী যত ক্রুসেডার সম্প্রদায়!

ওহে মুসলিম মা-বোনের সম্ভ্রম নিয়ে ক্রীড়াকারী যত সম্প্রদায়!

ওহে ক্রুসেডার অভিশপ্ত ইহুদী সম্প্রদায়!

তোরা পৃথিবীর যে যেখানেই আছিস, আয়, জেরুযালেমে আয়। তোদের পিতৃভূমি (!)-তে একত্রিত হ, হে আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! খুব শীঘ্রই তোরা দেখতে পাবি, তোদের বোমা আর কামান-ট্যাংকের শক্তি আল্লাহর গযব থেকে তোদেরকে রক্ষা করতে পারে কিনা! আমরা আসছি তোদের ঘরে ঘরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য, এমন ধ্বংসযজ্ঞ যা ইতিহাস কোনোদিন দেখেনি, ইতিহাস কোনোদিন শুনেনি, কোনো ঐতিহাসিক কোনোদিন কল্পনাও করেনি, যেই ধ্বংসযজ্ঞ চলবে পৃথিবীতে একজন ইহুদী জীবিত থাকা অবধি! আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোদের লাশের দূর্গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে, তোরা পোকা-মাকড়ের আহার্যে পরিণত হয়েছিস, তোদের নেতাদের বিগলিত হাড্ডিগুলো কুকুর আর শূকরেরা মজা করে ভক্ষণ করছে! তরবারি তোদের মাথার উপর চলে এসেছে, একটু মাথা উঁচু করে দেখ্, ওহে খোদার শত্রুদল! আল্লাহর গযব আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হ! ইহুদীবাদকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিতে আমরা আসছি...............

ওহে ক্রুসেডার হিন্দু সম্প্রদায়!

তোদের শ্মশানগুলোকে প্রশস্ত করতে থাক্, চিতার সংখ্যা বাড়াতে থাক্, খুব শীঘ্রই তোদের লাশের বহর আসছে! শ্মশানঘাটগুলোকে মহাশ্মশানে রূপান্তরিত করা হবে। তোদের শবদাহে পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে! ওহে গো-মূত্র পানকারী নাপাক সম্প্রদায়! ওহে মালাউন সম্প্রদায়! শুনে রাখ্, দিল্লীর লাল কেল্লায় ইসলামের কালো পতাকা উড্ডীন না হওয়া পর্যন্ত "গাযওয়াতুল হিন্দ" বন্ধ হবে না। তোদের "অখণ্ড ভারত মাতা"র স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে আমরা আসছি। ভারতবর্ষে একজন হিন্দু থাকা পর্যন্ত এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না। তোদের সুন্দরীদের অলংকৃত করে বিয়ের সাজ সাজিয়ে রাখ্, আমরা আসছি তাদের দাসী-বাদী বানিয়ে ভোগ করার জন্য। ওহে শয়তান সম্প্রদায়, শুনে রাখ! সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সাথে শির্ক ও পৌত্তলিকতার কোনো নাম গন্ধ যতদিন থাকবে, হিন্দুদের একটি ছোট্ট রুসুম-রেওয়াজও যতদিন অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবে! ডাক্ তোদের সহযোগীদের, তোদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের, দেখ তারা এক আল্লাহর সামনে টিকতে পারে কিনা! তোদের পারমানবিক অস্ত্রগুলো তোদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় কিনা! মরণপণ লড়াইয়ের জন্য সকলেই প্রস্তুত হ! হিন্দু ধর্মকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিতে আমরা আসছি................

ওহে ক্রুসেডার খ্রিস্টান সম্প্রদায়!

মুসলিম ভূমিতে স্কুল, কলেজ আর হাসপাতালের জন্য জমি ক্রয় না করে গোরস্তানের জায়গা কিনতে থাক্, আমিতো দেখতে পাচ্ছি তোদের লাশগুলো কবরে জায়গা না পেয়ে শকুন আর কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে! তোদের সাথে দেখা হবে মালহামাতুল কুবরার ময়দানে। একজন মুসলমান জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়া হবে না। তোরা প্রস্তুত থাক্ আমাদের কুরবানীর পশু হওয়ার জন্য আর তোদের মা-বোন ও মেয়েদেরকে সাজিয়ে রাখ্ আমাদের দাসী-বাদী হওয়ার জন্য। তোদের সীমালঙ্ঘনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। খুব শীঘ্রই তোদের জাহান্নামে পাঠানোর পয়গাম আসছে। প্রস্তুত হ।

ওহে আমেরিকা! পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তোদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে আমরা আসছি!!! তোদের নামটা শুধু ইতিহাসেই বাকী থাকবে, ওহে সমকামী সম্প্রদায়!!! তোর চ্যালাপ্যালা আর সাঙ্গো-পাঙ্গোদের নিয়ে তুই প্রস্তুত হ... আমরা আসছি, খ্রিস্ট ধর্মকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় জানাতে.....

খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ........

ওহে ক্রুসেডার ন্যাঁড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়!

শুধু মাথা ছিলা নয়, এবার তোদের সারা শরীরের চামড়া তুলে ফেলা হবে, মর্মন্তুদ আযাবের জন্য প্রস্তুত হ, দুর্গন্ধময় হায়েনার দল! আহ্! তোদের বিভৎস লাশগুলো কুকুর-শিয়ালেরা কিভাবে ভক্ষণ করছে! ওহে নিকৃষ্ট জানোয়ারের দল! তোদের হায়েনাগিরির বেশি দিন হায়াত নেই। যত পারিস্ করতে থাক, শীঘ্রই তোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হবে ক্ষুধার্ত

সিংহের ন্যায়, তখন তোরা পালাবার জায়গা পাবি না। তোদের উপসনালয়গুলো ধ্বংস করে দেয়া হবে, তোদের মূর্তিগুলোকে সহ তোদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রস্তুত হ! বৌদ্ধ ধর্মকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিতে আমরা আসছি..........

আযরাঈলের পদধ্বনি শুনা যায়.....

ওহে ক্রুসেডার নাস্তিক-মুরতাদ সম্প্রদায়!

ওহে জারজ সম্প্রদায়! ওহে সৃষ্টির নিকৃষ্ট কুলাঙ্গারেরা! তোরা যেই আল্লাহকে অস্বীকার করে আসছিস্, সেই আল্লাহর ফরমান চলে এসেছে। তোদেরকে কুরবানির গরু বানানো হবে। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে জবাই করা হবে। আল্লাহর দুনিয়াতে থাকার কোনো অধিকার তোদের নেই। এমন কেউ আছে কি তোদেরকে আল্লাহর রোষানল থেকে রক্ষা করবে? সুতরাং প্রস্তুত হ!

ওহে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানেরা! ওহে ইহুদী আর নাস্তিকেরা! ওহে দুনিয়ার তাবৎ ত্বগুত ও বাতিল সম্প্রদায়! ওহে পাপিষ্ঠের দলেরা!

তোরা আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিস। তোরা তো সেই সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর সাথে শিরকত করিস, তাকে অস্বীকার করিস্, আল্লাহর পবিত্রতাকে অপছন্দ করিস, যারা আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া থেকে বিদায় জানাতে চাস্, মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিঃশ্চিহ্ন করে দিতে চাস্। তোরা তো সেই পাপী সম্প্রদায়, যারা মদ ও কামরিপুর দাস, তোরাই তো সেই সকল জাতি যারা নিজেদের মা ও মেয়েদের লজ্জাস্থানকে

নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছিস, তোরাই তো সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহ তাআলার বিধানগুলোর তোয়াক্কা করিস নি, উপরন্তু চরম সীমালঙ্ঘন করেছিস।

সকলেই শুনে রাখ্!

খুব শীঘ্রই পৃথিবীতে তোদের যমদূতের আবির্ভাব ঘটবে, তোদের আযরাঈলের আত্মপ্রকাশ খুব নিকটবর্তী। তোদের রাজ্যগুলোতে টর্নেডো আর সাইক্লোন চালানো হবে, মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা শুরু করা হবে, তোদেরকে মূলা আর গাজরের মতো কাটা হবে, তোদের নারীদেরকে দাসী-বাদী বানানো হবে, হয়তো তোরা আল্লাহর বিধান মেনে জান্নাতের পথে আসবি, নয়তো তোদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। খুব শীঘ্রই তোদের পরিণতি তোরা দেখতে পারবি! প্রতিশ্রুত সেই সময় ইনশাআল্লাহ খুবই নিকটে!

আরো শুনে রাখ্! আমরা আসছি.......

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা খায় না, কিন্তু বাতিলের গোশত-ই আমাদের খাদ্য..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা পান করে না, কিন্তু ত্বগুতের রক্ত-ই আমাদের পানীয়..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা ঘুমায় না, কিন্তু কুফ্ফারদের ঘুমকে হারাম করি..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা কথা বলে না, কিন্তু রণহুঙ্কারে আসমান যমীন প্রকম্পিত করি........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক করি না, তবে দুশমনের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আনন্দ উপভোগ করি.......

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে ময়দানে লড়ে যাই অবিরাম, কিন্তু তোদের স্ত্রী-কন্যা আর মা-বোনদেরকে দাসী-বাদী বানিয়ে ভোগ করতে খুব পছন্দ করি.....

ওহে বাতিলের দল! তোদের সাথে মোকাবেলা হবে খুব শীঘ্রই.....

সুতরাং তোরা অপেক্ষা করতে থাক্, আমরাও তোদের সাথে সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

ওহে মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর তারিক বিন যিয়াদের বোনেরা!

এবার খুশি হয়ে যাও। কান্নার মাতম বন্ধ কর। এবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আর ইহুদিদের বসতিগুলোতে মাতম শুরু হওয়ার পালা। এবার তাদের মায়েদের বুক খালি হবার পালা। এবার তাদের স্ত্রীদেরকে বিধবা করার পালা। এবার তাদের সন্তানদেরকে এতীম করার পালা।

তাই, বুকে পাথর বেঁধে, তোমাদের ভাই ও স্বামীদেরকে ময়দানে পাঠিয়ে দাও। তাদের বিচ্ছেদে সবর কর! আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, তিনিই তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের হেফাযত করবেন। তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। সুউচ্চ জান্নাতে তোমাদেরকে আবার একত্রিত করবেন। সেদিন খুব দূরে নয়!

প্রিয় মায়েরা!

এবার আপনি নিজের সন্তানকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সাজিয়ে তুলুন। কেননা, বরযাত্রীর লোকেরা এখন দিল্লী আর বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকল বাদশার বাদশাহী খতম হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এক আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের সময় নিকটবর্তী। সুতরাং এখন সময় আনন্দের, হতাশার নয়। এখন সময় উল্লাসের, চিন্তামগ্নতার নয়। চেহারায় উদাসীনতা নয়, বরং উৎফুল্লতা থাকা চাই। চোখ মুছে ফেলুন। দু'চোখে অশ্রু নয়, এখন বিজয়ের চমক থাকা চাই......

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴿٣٣﴾

"৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর (ইসলাম)-কে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (০৯ সূরা তাওবা:৩২-৩৩)

نَصْرٌ مِّن ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"(শীঘ্রই আসছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।" (৬১ সূরা ছফ: ১৩)

দুআ!

সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, হে বিশ্ব জগতের পালনকর্তা!

প্রশংসা তোমার সৃষ্ট জগতের সম পরিমাণ হয়, তোমার সন্তুষ্টির অনুপাতে হয়, তোমার আরশের ওজন পরিমাণ হয়, তোমার লিখিত বাণীসমূহের কালি পরিমাণে হয়।

হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সীমা নির্ধারণ করতে পারবো না। তুমি নিজের প্রশংসা যতটুকু করেছো তুমি সেই পরিমাণ প্রশংসার মালিক!

হে আল্লাহ! দরূদ ও সালাম বর্ষণ কর আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যিনি হাশেমী এবং উম্মী ছিলেন। আরও রহমত নাযিল কর তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নিকটবর্তী ফেরেশতাদের উপর। (আমীন)

হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে চলে যাওয়া ভাই-বোনদেরকে তুমি ক্ষমা কর এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য সামান্যতম হিংসা বা দুশমনীও পয়দা করো না। (আমীন)

হে রব! নিশ্চয়ই তুমি মেহেরবান এবং দয়ালু। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে আর আমাদের মাতা-পিতাকে এবং সমস্ত মুমিন ভাই-বোনকে তুমি মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, দুআ কবুল করনেওয়ালা। (আমীন)

হে পরওয়াদেগার! তোমার হাবীবের উম্মতকে মাফ করে দাও। আমাদেরকে তুমি হিদায়াত কর। আমাদেরকে তুমি সঠিক পথ দেখাও। আমাদেরকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী দান কর। (আমীন)

হে আমাদের রব! সারা দুনিয়ার উলামায়ে কেরাম, ত্বলেবে ইলম, সালেকীন, দাঈ, মুজাহিদীনদের তুমি কবুল করে নাও। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, মারকাজ, মুজাহিদদের ঘাঁটিসমূহকে তুমি হেফাযত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তোমার দীন কায়েমের মেহনতে আমাদের সকলকে তুমি ব্যবহার কর। তোমার দ্বীনের খেদমত করার মতো যোগ্যতা আমাদেরকে দিয়ে দাও। (আমীন)

হে আমাদের রব! তোমার পছন্দনীয় আমল সমূহ করার তাওফীক দাও। "তোমার ইবাদত ছাড়া রাত ভালো লাগে না, দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া দিন ভালো লাগে না, তোমার যিকির ছাড়া একটি মুহূর্তও ভালো লাগে না, শাহাদাত ছাড়া মৃত্যু ভালো লাগবে না, তোমার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ছাড়া আখিরাত ভালো লাগবে না, তোমার দীদার ছাড়া জান্নাত ভালো লাগবে না"- হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এ কথার উপর সত্যবাদী বানিয়ে দাও। এসব নেয়ামত থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না। (আমীন)

হে আমাদের মা'বুদ! পৃথিবীর যেখানে যেখানে নির্যাতিত মুসলমান রয়েছে, তাদেরকে তুমি সাহায্য কর, তাদেরকে নিরাপত্তা দান কর। তাদের ভুল-ত্রুটি আর গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। আমাদের গুনাহের কারণে উম্মতের উপর আযাব চাপিয়ে দিও না। (আমীন)

আমাদেরকে কাফিরদের পরীক্ষাস্থল বানিও না। তোমার কৌশল থেকে আমরা তোমার কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি, হে মা'বুদ!

হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না।

হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছো।

হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই তো আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। (আমীন)

হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ! তুমি হিদায়াতের দরজা সাধারণভাবে বিশ্বের সকল জাতির জন্য খুলে দাও।

হে আল্লাহ! তুমি হিন্দুদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তুমি বৌদ্ধদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তুমি খ্রিস্টানদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তুমি নাস্তিকদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তুমি মুরতাদদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তুমি ইহুদীদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তুমি অন্য সকল বিধর্মীদেরকে হিদায়াত কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! তারাও তো তোমার হাবীবেরই (দাওয়াতী) উম্মত। হে আল্লাহ! হিদায়াত কি তোমার হাতেই নয়? হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলেই

কি সকলেই হিদায়াত পেয়ে যাবে না? হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। (আমীন)

হে মহা পরাক্রমশালী, মহা মহিমান্বিত! আমরা যুদ্ধ চাই না, আমাদেরকে, মুসলিম উম্মাহকে, সারা দুনিয়ার সকল মানুষকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা কর। (আমীন)

হে আল্লাহ! যদি আমাদের জন্য যুদ্ধের ফয়সালা হয়েই গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কদমগুলোকে দৃঢ় রাখ, বেশি বেশি তোমার যিকির করার তাওফীক দান কর। আমরা তোমার আশ্রয় চাচ্ছি যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন হতে, তোমার অসন্তুষ্টির মৃত্যু হতে। তুমি আমাদেরকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করাও, তোমার হাবীবের শহরে মৃত্যু দান কর। আমাদের দীল থেকে দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয় দূর করে দাও। তুমি আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্যাদা দান কর। (আমীন)

ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমানের হিফাযত কর। হে আল্লাহ! যুদ্ধের ময়দানে তুমিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। তুমি আমাদের সাহায্য ও বিজয় দান কর। (আমীন)

হে প্রতিশোধগ্রহণকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ! তোমার হাবীবের উম্মতের উপর তরবারি উত্তোলনকারী কাফিরদের তুমি আযাব দাও, তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার কর, তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি কর এবং তাদের উপর তোমার আযাব-গযব নাযিল কর। (আমীন)

ইয়া আল্লাহ! তুমি ক্রুসেডার কাফিরদের আযাব দাও তারা আহলে কিতাব হোক বা মুশরিক। যারা তোমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তোমার

রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তোমার পথ থেকে (অন্যদের) নিবৃত্ত করে, তোমার দীনকে দুনিয়া হতে মিটিয়ে দিতে চায়, তোমার নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে আর তোমার সাথে অন্য মাবুদকে ডাকে; অথচ তুমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। তুমি বরকতময় এবং যালিমরা যা কিছু বলে তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে। (আমীন)

হে আল্লাহ! সর্বোতভাবে তুমি আমাদের হয়ে যাও এবং আমাদেরকে তোমার বানিয়ে নাও। (আমীন)

দরুদ ও সালাম তোমার হাবীব ﷺ-এর প্রতি, আহলে বাইতগণের প্রতি, সকল নবী রাসূলগণের প্রতি।

আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা- তোমার সন্তুষ্টি ও মহব্বত। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তুমিই বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

তুমি আমাদের সকলকে কবুল কর। আমীন। ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

وَمَا يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلاَ ٱلظُّلُمَاتُ وَلاَ ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلاَ ٱلظِّلُّ وَلاَ ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلأَحْيَآءُ وَلاَ ٱلأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

"দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো। সমান নয় ছায়া ও তপ্ত রোদ। আরোও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদের শুনাতে সক্ষম নন। আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী।"

(৩৫ সূরা ফাতির: ১৯-২৩)

নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী

(গরীব ইসলাম)

[কিতাবটি তিন খণ্ডে রচিত]

-ঃ (তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত) ঃ-

উৎস:

১. কুরআন মাজীদ

২. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহিমাহুল্লহ

৩. বুখারী শরীফ

৪. মুসলিম শরীফ

৫. আবূ দাউদ শরীফ

৬. তিরমিযী শরীফ

৭. রিয়াযুস্ সালেহীন, ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ

৮. হায়াতুস সাহাবাহ, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কান্ধলভী রাহিমাহুল্লাহ

৯. ফাযায়েলে সাদাকাত, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ

১০. ফাযায়েলে আমাল, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ

১১. মুন্তাখাবে হাদীস, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কান্ধলভী রাহিমাহুল্লাহ

১২. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (১-৬ খন্ড), হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ

১৩. কিমিয়ায়ে সাআদাত (১-৪ খন্ড), হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ

১৪. বিদায়াতুল হিদায়াহ, হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ

১৫. তাম্বীহুল গাফেলীন, হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্ল

১৬. সীরাতে ইবনে হিশাম

১৭. আর রাহীখুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

১৮. শমশীরে বে-নিয়াম (নাঙ্গা তলোয়ার, ১-৬ খন্ড), এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

১৯. সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবীয়্যাত (নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন), ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

২০. الزهاد مأة (দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী), মুহাম্মাদ সিদ্দীক মিনশাভী

২১. মুকাদ্দাস জঙ্গ, হযরত হায়াতুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

২২. حادي الأرواح الى بلاد الأفراح (জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবন), ইমাম কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ.

২৩. মরণ কে বা'দ কেয়া হোগা (মরণের পরে কী হবে), মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দ শহরী

২৪. কিতাবুল জিহাদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ

২৫. আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান (আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন), শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ

২৬. Defense of the Muslim Land (মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা), শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ

২৭. *The Dust Will Never Settle Down (প্রিয়নবী ﷺ কে অবমাননার শাস্তি), শাইখ আনওয়ার আল আওলাকী রাহিমাহুল্লাহ*
২৮. *Be Aware Of Takfir (তাকফীরের ব্যাপারে সতর্ক হোন), শাইখ আবূ হামজা আল মিশরী*
২৯. *Join The Caravan (জিহাদী কাফেলায় যোগ দিন), শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ*
৩০. *Islamic Guide to Sexual Relations (যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনা), মুফতী মুহাম্মাদ ইবনে আদম আল কাওসারী দা.বা., লন্ডন*
৩১. *End Times And Imam Mahdi (শেষ যামানা এবং ইমাম মাহদী), হারুন ইয়াহিয়া*
৩২. *তাওহীদ কী ক্বওল (তাওহীদের আহ্বান), মাওলানা আবূ উসামা ইবনুল মোবারক সাহেব*
৩৩. *ইসলাম কী পয়দায়েশ আওর মওত, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস হাফিযাহুল্লাহ*
৩৪. *ইসলাম কী মওত আওর হামারে কামোঁ, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস হাফিযাহুল্লাহ*
৩৫. *ইস্ যামানে মেঁ ইসলাম, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস হাফিযাহুল্লাহ*
৩৬. *উস্ নবী ﷺ কোন্ হ্যাঁয়, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস হাফিযাহুল্লাহ*
৩৭. *খত্নামা, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস হাফিযাহুল্লাহ*
৩৮. *মুহাম্মাদ বিন কাসীম, নসীম হেযাজী*
৩৯. *কাসীদা, শাহ নেয়ামাতুল্লাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহ*
৪০. *কিতাবুল ফিতান, হযরত নুআইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ*
৪১. *ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হযরত মাওলানা আসেম ওমর সাহেব*
৪২. *Imam Mahdi, Coming Soon (ইমাম মাহদী শীঘ্রই আসছেন), শাইখ সানাউল্লাহ সিরাজী*
৪৩. *Black Flag From Khorasan (খোরাসান থেকে কালো পতাকা)*
৪৪. *Black Flag From Syria (সিরিয়া থেকে কালো পতাকা)*
৪৫. *Black Flag From Arabia (আরব থেকে কালো পতাকা)*
৪৬. *The End Of the World (মহাপ্রলয়), ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আরিফী*
৪৭. *বাইতুল্লাহ কী সফর, শাইখ তাওফিক বিন খলফ বিন আব্দুল্লাহ আল রিফায়ী*
৪৮. *ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম ﷺ, হযরত ডা. আব্দুল হাই আরিফী রাহিমাহুল্লাহ*
৪৯. *ফুরূউল ঈমান, হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ*
৫০. *মোনাজাতে মকবুল, হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ*
৫১. *খোৎবাতুল আহকাম, হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ*
৫২. *কাসাসূল আম্বিয়া, আল্লামা ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ, ইত্যাদি!!!*